S@ifur's BCS

৩৬তম লিখিত

- ☑ বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ
- ☑ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ঃ ১৯৪৭-১৯৭১

- ❖ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ বা বাঙালীরা সংকর জাতি
- ❖ পলাশী যুদ্ধের পটভূমি
- ❖ ভাষা আন্দোলন
- ❖ ছয়দফা আন্দোলন
- ❖ যুদ্ধাপরাধ এবং বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া
- ❖ বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার
- ❖ মুক্তিযুদ্ধ কারণ
- ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

মোঃ মাহফুজুর রহমান
SMS : 01613 43 20 65

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

BCS নিয়ে যে কোন পরামর্শ ও
অভিমত দিয়ে Comment/Like করুন-
www.facebook.com/groups/saifurs.bcs.achievement

Scanned by CamScanner

36th BCS Syllabus

* বাংলাদেশের প্রাচীন যুগ থেকে সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

* **মুক্তিযুদ্ধ ও এর পটভূমি :** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলী, মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গ ও জাতিসংঘের ভূমিকা, পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যাহার।

BCS প্রশ্নাবলী — বাংলাদেশের ইতিহাস

- ☑ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীনা ও যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী মনোভাবের কারণ কি ছিল? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। **(৩৩তম বিসিএস)**
- ☑ যুদ্ধাপরাধ কী? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কয়টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। **(৩৩তম বিসিএস)**
- ☑ ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। **(৩২তম বিসিএস)**
- ☑ ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক পুর্ণজাগরণ ও আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের বীজ বপনে কি ভূমিকা রেখেছিল? **(৩১তম বিসিএস)**
- ☑ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করুন। **(২৭তম বিসিএস)**
- ☑ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা আন্দোলন ও ছয় দফা কর্মসূচির ভূমিকা আলোচনা করুন। **(১৮তম বিসিএস)**
- ☑ ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি ও এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। **(১৩তম বিসিএস)**
- ☑ 'বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। **(১১তম বিসিএস)**

Student Work — বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ বা বাঙালীরা সংকর জাতি

জাতীয়বাদ একটি অনুভূতি বা অনুপ্রেরণা মাত্র। বিশ্বের প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এ অনুভূতি বা অনুপ্রেরণা বিদ্যমান। অর্থাৎ বিশ্বের প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্ব-স্ব জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদের সাথে জাতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জাতীয়তাবাদকে আধুনিক বিশ্বের রাজনীতির একটি অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি বলে গণ্য করা হয়। ষোল শতকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলী সর্বপ্রথম এ মতবাদ প্রকাশ করেন। অতঃপর বিভিন্ন পটভূমিকায় এ জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ ঘটে।

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা : সাধারণত কোনো জনসমষ্টির নিজের ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় জীবন গড়ে তোলার মানসিক অনুভূতি ও অনুরাগকেই জাতীয়তাবাদ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো জাতি যখন স্বজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ-সংস্কৃতিতে ঐক্যবদ্ধ চেতনার প্রতিফলন ঘটায় তখন সে স্বজাত্যবোধ বা চেতনাকে জাতীয়তাবাদ বলা হয়। জাতীয়তাবাদ মানুষকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি : সাধারণত বংশগত ও ভাষাগত ঐক্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐক্য, ভৌগোলিক নৈকট্য প্রভৃতি বিষয় জাতীয়তাবাদ উৎপত্তির মূল উপাদান। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির মূলেও উক্ত উপাদানগুলো পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন বংশের মানুষ একই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বসবাস করায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় হয়েছে। তাছাড়া একই ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হওয়ায় বাঙালিদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্যবোধও জাগ্রত হয়েছে। ভৌগোলিক ঐক্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একই ভূখণ্ডের ভিতর বসবাস করার ফলে বাঙালিদের মধ্যে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছে। এভাবেই ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ :

ভাষা-সংস্কৃতির ঐক্য বাঙালি জাতীয়তাবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হওয়ায় বাঙালিদের মধ্যে জাগ্রত হয় এক সুদৃঢ় ঐক্যবোধ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর যখন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত আসে, ঠিক তখনই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। নিম্নে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারাসমূহ আলোচনা করা হলো-

১) **ভাষা আন্দোলন :** বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের সাথে বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা এবং বাংলার তরুণ সমাজ কর্তৃক এর এর প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের মধ্যে ঐক্যবোধের সূত্রপাত হয়। এ ঐক্যবোধের প্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার জনগণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলন বাঙালিদের ভাষাভিত্তিক সুপ্ত জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলে। ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের রক্তের বিনিময়ে জাতীয়তাবাদী দাবি আদায়ের শিক্ষা দেয়। সমগ্র জাতিই সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে আরো প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার সাহস ও অনুপ্রেরণা লাভ করে। এ আন্দোলন সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর করে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই বাঙালি চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাঙালিদের মধ্যে স্বাধিকার অর্জনের আকাঙ্খা তীব্র হয়। এখান থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের যাত্রা শুরু।

২) **১৯৫৪ সালের নির্বাচন :** ১৯৫৪ সালের মার্চে পূর্ববাংলার আইনসভার নির্বাচনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবোধ আরো জোরদার হয়। এ নির্বাচনে কেন্দ্রের বিমাতাসুলভ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের বিরোধিতার প্রকাশ ঘটে। তারা তাদের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবির প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন জানায়।

৩) **১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন :** ১৯৫৮ সালে গঠিত এস.এম শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বের হলে দেখা যায় এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করাসহ কতিপয় কালাকানুন সংযোজিত হয়েছে। বাংলার ছাত্রসমাজ তথা গোটা পূর্ব পাকিস্তানবাসী হামিদুর রহমানের শিক্ষানীতি সঙ্গত কারণেই মেনে নিতে পারে নি। বরং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে একে প্রতিহত করার প্রয়াস পায় যা ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন নামে পরিচিত।

৪) **ছয় দফা আন্দোলন :** পশ্চিম পাকিস্তনি শাসকগোষ্ঠীর নির্লজ্জ শোষণ-পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালিরা একান্তভাবে স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং এর প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে নিজেদের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি পেশ করে যা বাঙালিদের কাছে 'মুক্তিসনদ' হিসেবে পরিগণিত। ছয় দফা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরো জোরদার করে। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের জাতীয় চেতনাবোধ ও মনোবল আরো সুদৃঢ় হয়।

৫) **১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান :** বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের দাবি সংবলিত এগার দফার ভিত্তিতে পরিচালিত ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতীয় চেতনাকে আরো সংগ্রামী রূপ দান করে। এ আন্দোলনে শাসকগোষ্ঠীর ভিত নড়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে।

৬) **১৯৭০ সালের নির্বাচন :** বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন একটি মাইলফলক বিশেষ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের একচেটিয়া বিজয় প্রমাণ করে যে, পূর্ববাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের দেশ নিজেরা গড়তে চায়। এ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের জাতীয় সংহতি আরো সুদৃঢ় হয়।।

৭) **১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম :** ১৯৭১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তদানীন্তন সামরিক সরকার আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে না দিয়ে টালবাহানা শুরু করে। তাই বাঙালিরা স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের জন্য ১৯৭১ সালে এক রক্ষক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ সংগ্রামের সফলতায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাস্তবরূপ দান করে।

বাঙালি জাতির উৎপত্তি বা বাঙালীরা সংকর জাতি :

- **বাঙালী জাতীর ইতিহাস :** বর্তমান বাঙালী জনগোষ্ঠী বহুকাল ধরে নানা জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এর মূল কাঠামো সৃষ্টির কাল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র বাঙালী জনগোষ্ঠীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) প্রাক আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী এবং (খ) আর্য নরগোষ্ঠী। এদেশের আর্যদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অনার্যদেরই বসতি ছিল এবং এই প্রাক আর্য নরগোষ্ঠী বাঙালী জীবনের মেরুদন্ড। আর্যদের আগমনে জীবন উৎকর্ষমন্ডিত হয়ে উঠে।

Scanned by CamScanner

- **বৈদিক যুগে বাংলাভাষী :** বৈদিক যুগে আর্যদের সাথে বাংলাভাষীর কোনো সম্পর্ক ছিল না। বৈদিক গ্রন্থাদিতে বাংলার নরনারীকে অনার্য ও অসভ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার আদিম অধিবাসী আর্য জাতি থেকে উদ্ভূত হয়নি। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয় এই চার শাখায় বিভক্ত ছিল।

  নিগ্রোদের মত দেহগঠনযুক্ত এক আদিম জাতির এ দেশে বসবাসের কথা অনুমান করা হয়। কালের পরিবর্তনে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত। অষ্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙালী জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ তাদের নিষাদ জাতি বলেন। প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অষ্ট্রিক জাতি নেগ্রিটোদের উৎখাত করে। এরাই কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতির পূর্ব পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত। বাঙালীর রক্তে এদের প্রভাব আছে; বাংলা ভাষার শব্দে ও বাঙালী জীবনের সংস্কৃতিতে এরা প্রভাব বিস্তার করেছে। অষ্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণেই সৃষ্টি হয়েছে আর্যপূর্ব বাঙালি জনগোষ্ঠী। এদের রক্তধারা বর্তমান বাঙালী জাতির মধ্যে প্রবাহমান। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর জনসমষ্টির মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলছিল, তার সঙ্গে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙালী জাতি। এ জন্য প্রাক আর্য আদিম জাতি বাঙালি জনসাধারণের তিনচতুর্থাংশ অধিকার করে রয়েছে। বাংলা ভাষা ও গ্রামীণ জীবনে এদের স্পষ্ট প্রভাব থাকলেও বাংলাদেশে আর্য অভিযানে জনসমষ্টির সংমিশ্রণ ঘটে। বাংলাদেশে আর্যদের পরেই এদের আগমন ঘটে বলে বাঙালীর রক্তের সঙ্গে এদের মিশ্রণ উল্লেখযোগ্য নয়, বাংলার উত্তর ও উত্তর পূর্ব সীমান্তে এদের অস্তিত্ব রয়েছে। গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা ইত্যাদি উপজাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত।

- **মৌর্য ও গুপ্ত যুগ পর্যন্ত বাংলা :** মৌর্যবিজয় থেকে গুপ্তবংশের অধিকার পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে মোট আটশ বছর ধরে বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে আর্যীকরণের পালা চলে। তবে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তযুগেই বাংলাদেশে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি দৃঢ়মূল হয়। আর্যরা ব্রহ্মাবর্ত ত্যাগ করে প্রথমে আর্যাবর্তে বা উত্তর ভারতে আগমন করে এবং পরে মগধ, অঙ্গ, মিথিলা, কলিঙ্গ, রাঢ় ও বঙ্গে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে সেমীয় গোত্রের আরবীয়েরা ইসলাম ধর্ম প্রচার ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বাঙালী জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়। তাদের অনুসরণে নেগ্রিটো রক্তবাহী হাবশীরাও এদেশে আসে।

  এমনি ভাবে অন্তত দেড় হাজার বছরের অনুশীলন গ্রহণ বর্জন ও রূপান্তরীকরণের মাধ্যমে বাঙালীর জনজীবন গড়ে উঠেছে। তাই বর্তমান বাঙালী জাতি অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য, মঙ্গোলীয়, সেমীয় ইত্যাদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্তধারার সংমিশ্রণে এক বিচিত্র জনসমষ্টি হিসাবে বিদ্যমান। এদেশে আর্যধর্ম বিস্তারের আগে বৈদিক ধর্মের সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ মিলে না। আর্যসভ্যতার সংস্পর্শে এদেশে বৈদিক ধর্মের প্রচলন হয়। সম্রাট অশোকের সময় এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। তখন জৈন ধর্মেরও প্রচলন হয়। গুপ্তযুগে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম ও তান্ত্রিক মতবাদের ব্যাপক প্রসার শুরু হয়। অষ্টম শতক থেকে বৈষ্ণব ধর্মের সম্প্রারণ ঘটে। গুপ্ত যুগে শৈব ধর্মের প্রচলন ছিল। পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম পুনরায় ব্যাপকতা লাভ করে। পাল যুগের পর এদের বৌদ্ধ ধর্ম সহজিয়া ধর্মরূপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সহজিয়া ধর্মমতের আচার্যগণ সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত। সেন রাজাদের আমলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রবল রূপ ধারণ করে। তবে হিন্দু নামে এক জাতির পরিচয় বিধৃত হয় মুসলিম শাসনামলে। পরবর্তী কালে মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে এদেশে ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে। পর্তুগীজ ও ইংরেজ আগমনে এদেশে প্রচলিত হয় খ্রীষ্টধর্ম। এভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মমতের জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে আছে তার বিচিত্র প্রতিফলন। বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বাঙালীর উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন সাহিত্যে ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্রও আছে। দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাঙালীর উদ্যমশীলতা, সাহসিকতা ও বিদ্যোৎসাহিতার প্রশংসা করেছেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল প্রাক-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ জাতীয়তাবাদ হঠাৎ করে বিকশিত হয়নি। এর বিকাশের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্তমান। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ ঘটে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। উপসংহারে বলা যায় যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন রেসের আগমনে এ সংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছে, আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তির মূল সূত্র। বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন ও নব্য প্রস্তর যুগের এবং তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন। এ সকল যুগের বাংলার পার্বত্য সীমান্ত অঞ্চলেই মানুষ বাস করত এবং ক্রমে তারা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

Scanned by CamScanner

Teacher's Discussion

বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ

ব্রিটিশ ভারত ও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ সালে ভারতের তৎকালীন বড় লাট লর্ড জর্জ নাথানিয়েল কার্জন (লর্ড কার্জন নামে পরিচিত) বাংলা প্রদেশ ভাগ করেন, যা ইতিহাসে 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে একই বছর ১৬ অক্টোবর অবিভক্ত বাংলার ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মালদা জেলা চিফ কমিশনার শাসিত আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়, যদিও মাত্র ৬ বছরের মধ্যে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। ১৯০৫-১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস ঘটনাবহুল। বঙ্গভঙ্গ ও রদকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের এতো দিনের গড়ে ওঠা ঐক্যের বিপরীতে অনৈক্যের সূত্রপাত ঘটে। বাংলার রাজনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এর ফলে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের সূচনা হয়। বঙ্গভঙ্গের তাৎক্ষণিক ফল ১৯০৬ সালে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী পৃথক দল মুসলিম লীগ গঠন। এ দল যে কোনো মূল্যে বঙ্গভঙ্গ বলবৎ রাখার পক্ষে ছিল। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় অংশ জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগিতায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের ওপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ অব্যাহত রাখে। এ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের ১৯০৯সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবীকে স্বীকৃতি দিয়ে রাজনীতিতে নতুন ধারার সূচনা ঘটায়। দু'বছর পর ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে হিন্দু নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী সংঘাতের সৃষ্টি করে। এরপর সাময়িকভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা চললেও ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি পর্যন্ত দু'সম্প্রদায়ের চরম বৈরী সম্পর্ক বিরাজ করে।

বঙ্গভঙ্গের পটভূমি :

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের সময় বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলেও এর বহু আগে, বলতে গেলে বাংলা প্রদেশ গঠনের পর থেকেই সরকারিভাবে বাংলার বিভক্তি নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়। হেনরি কটনও মনে করেন বঙ্গভঙ্গ অনেক দিনের আলোচনা ও পর্যালোচনার ফল। লর্ড কার্জনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন তিন জন ব্রিটিশ আমলা-বাংলার ছোট লাট অ্যান্ড্রু ফেজার, আসামের চিফ কমিশনার (পরে পূর্ব বাংলার ও আসামের প্রথম ছোট লাট) ব্যামফিল্ড ফুলার এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব হার্বার্ট রিজলে।

১৮৫৪ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে রাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। অমলেন্দু ত্রিপাঠীর মতে, পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বাদ দিয়ে সমস্ত ভারত ছিল বাংলার অন্তর্ভুক্ত। ভারতের দি ফাস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্টে (১৮৫৫-১৮৫৬) বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন দেখানো হয় ২ লক্ষ ৫৩ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৪ কোটি। স্বয়ং লর্ড ডালহৌসি তখন স্বীকার করেন একজন শাসকের পক্ষে এতো বড় একটি প্রদেশ শাসন করা রীতিমত কষ্টকর। বঙ্গভঙ্গের পেছনে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলো ভূমিকা রাখে –

০১. **হেনরি নর্থকোর্টের সুপারিশ- ১৮৬৭ :** ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতা অনুসন্ধানের জন্য ভারত সচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড হেনরি নর্থকোট ১৮৬৭ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বাংলা প্রদেশের প্রশাসনিক অসুবিধাকে দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলা বিভক্তির সুপারিশ করেন। এরপর ১৮৬৭ সালে বাংলার ছোট লাট উইলিয়াম গ্রে আবারো প্রদেশ বিভক্তির সুপারিশ করেন। তিনি একই সঙ্গে বোম্বাই ও মাদ্রাজের মতো বাংলার দায়িত্বও একজন লেফটেন্যান্ট গর্ভনরের হাতে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন।

০২. **লরেন্স প্রস্তাব :** তখনকার বড় লাট লরেন্স এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বাংলার কিছু অংশ যেমন, আসাম ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার বিকল্প প্রস্তাব দেন। সে মুহূর্তে বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে আলাদা করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেননি। তা সত্ত্বেও প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলার আয়তন ছোট করার পরিকল্পনা শাসক মহলের ভাবনায় বিশেষ স্থান পায়।

০৩. **ক্যাম্বেল প্রস্তাব :** ১৮৭২ সালে ভারতের প্রথম আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, বাংলা প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যা ৬ কোটি ৭০ লক্ষ। এর পরিপ্রেক্ষিতে ছোট লাট ক্যাম্বেল পুনরায় প্রশাসনিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৭৪ সালে আসমকে বাংলা ভাষী তিনটি জেলা সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া চিপ কমিশনারের অধীনে এনে বাংলা থেকে পৃথক করা হয়। যদিও বাংলার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা রোধে এ ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। তা সত্ত্বেও এ পরিকল্পনাকে বঙ্গভঙ্গের প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়।

০৪. **ওয়ার্ড পরিকল্পনা- ১৮৯৬ :** ১৮৯৬ সালে আসামের চিফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন।

০৫. **কটন পরিকল্পনা :** ওয়ার্ডের উত্তরাধিকারী হেনরি কটন এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি এর প্রধান দু'টি কারণ উল্লেখ করেন। প্রথমত, চট্টগ্রামকে অনুন্নত আসামের সাথে সংযুক্ত করে কোনো লাভ হবে না। দ্বিতীয়ত, এতে গণঅসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এর পর পর চট্টগ্রামবাসী, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং বাংলার আইন পরিষদের সদস্যদের বিরোধিতার কারণে উইলিয়াম ওয়ার্ডের পরিকল্পনা নাকচ হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

০৬. **কার্জনের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার গতি লাভ :** এভাবে সর্বশেষ যখন চট্টগ্রাম জেলা ও সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে না, বরং আসামের অন্তর্ভুক্ত করে আসামের আয়তন বৃদ্ধি করা হবে এ বিতর্ক চলছিল তখনই ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড় লাট হয়ে আসেন। লর্ড কার্জন এ সকল পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর বাস্তবায়নও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়।

০৭. **অ্যান্ড্রু ফ্রেজার পরিকল্পনা- ১৯০১ :** মধ্য প্রদেশের চিফ কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ১৯০১ সালে উড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং এর উপর ভারত সরকারের কর্ম সচিবরা বিভিন্ন পরিকল্পনা পেশ করেন। বড় লাট কার্জন তাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং এ বিষয়ে ভারত সচিব লর্ড হেমিলটনের সঙ্গে চিঠি বিনিময় করেন। এ্যান্ড্রু ফ্রেজার শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলা প্রদেশ বিভাগের সুপারিশ এবং এর পক্ষে রাজনৈতিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি এতে উল্লেখ করেন যে, যদি ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা হলে এ অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে।

০৮. **রিজলে পরিকল্পনা- ১৯০৩ :** লর্ড কার্জন বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করেন এবং ১৯০২ সালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাথে বাংলা প্রদেশের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করার বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করতে ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করেন। এ নির্দেশকে কার্যকর করতে ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র সচিব হাবার্ট রিজলে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করে চিফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করার প্রস্তাব পেশ করেন। এই পরিকল্পনাটি "Risley Note" বা রিজলে পত্র নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় সরকার সীমানা রদবদলের পর তা অনুমোদন করে। এ পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা ও অসন্তোষ দেখা দেয়। বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে স্মারকলিপি আসতে থাকে। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে ১৯০৩-০৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০০ সভা সমাবেশ হয়। শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কংগ্রেসের অধিবেশনে রিজলের পরিকল্পনাকে 'জঘন্য' আখ্যা দেয়া হয়। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রতিবাদ জানিয়ে মন্তব্য করা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার দু'টি প্রশাসনিক বিভাগের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে দুর্বল করতে চায়। পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত ঢাকা প্রকাশ একই মন্তব্য করে। এমন কি মুসলমানদের পক্ষ থেকেও এর প্রতিবাদ আসে। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদের সদস্য ইবেৎসন এসব প্রতিবাদের জবাবে সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, "বিভিন্ন সংস্থা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা প্রশাসনিক স্বার্থ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক প্রয়োজনে সকল স্তরের বিরোধিতা সত্ত্বেও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া উচিৎ।" লর্ড কার্জনও এ পরামর্শ মেনে নেন এবং পূর্ব বাংলার জনমতকে পক্ষে টানতে ১৯০৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা সফরের ঘোষণা দেন।

৯. **লর্ড কার্জনের পূর্ব বাংলা সফর :** পূর্ব বাংলা সফরকালে লর্ড কার্জন ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামে বক্তৃতা দেন এবং এখানে তিনি প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসে আরো কিছু এলাকা যুক্ত করার ইঙ্গিত দেন। যার ফলে একজন লেফটেন্যান্ট গর্ভনর, একটি আইন পরিষদ ও পৃথক রাজস্ব বোর্ড নতুন প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে থাকবে। তিনি মুসলমানদের পক্ষে টানার জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকাতে বক্তৃতায় বলেন, "পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনগণ প্রাচীন সুলতান-সুবেদারদের আমল থেকেই রাজনৈতিক ঐক্য থেকে বঞ্চিত; সে ঐক্য তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।" গভর্নর নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা করার এবং এ অঞ্চলের মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। এরপর কার্জন প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি পুনরায় পর্যালোচনা করেন এবং কিছু সংযোজনসহ ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। ৯ জুন ভারত সচিব ব্রডারিক এ পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং তা ১৯০৫ সালের ১০ জুলাই প্রকাশিত হয়।

বঙ্গভঙ্গের কারণ :

বঙ্গভঙ্গের কারণ বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকরা দুটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা প্রশাসনিক কারণকে বঙ্গভঙ্গের মুখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। ম্যাকলে, রিজলে, ইবেৎসেন, ফ্রেজার, গডলেক এবং লর্ড কার্জনসহ ব্রিটিশ কর্মকর্তারা মনে করেন প্রশাসনিক প্রয়োজনে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের বড় অংশই মনে করেন বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। অমলেশ ত্রিপাঠী, সুমিত সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে সেই মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য বঙ্গভঙ্গের পিছনে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণও বিদ্যমান ছিল।

Scanned by CamScanner

প্রশাসনিক কারণ :

গোড়া থেকেই প্রশাসনিক কারণকেই বঙ্গভঙ্গের কারণ হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। লর্ড কার্জন বার বার একে প্রথম শ্রেণীর প্রশাসনিক সংস্কার দাবি করেন। জে. আর. ম্যাকলে জোর দিয়ে বলেছেন বঙ্গভঙ্গের পেছনে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার বিষয়টি ছিল মুখ্য। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, বাংলা একটি বিশাল প্রদেশ। বিভক্তির আগে বিহার, ছোট নাগপুর, উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত ছিল। এটি আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং ১৯০১ সালের আদমশুমারী অনুসারে এর জনসংখ্যা ছিল ৪৮.৫০ মিলিয়ন এবং মাদ্রাজ প্রদেশের ৪২.৫০ মিলিয়ন। ফলে একজন গভর্নরের পক্ষে বিশাল প্রদেশের শাসন পরিচালনা দুরূহ হয়ে পড়ে। বাংলায় নিযুক্ত কর্মকর্তারা এই অসুবিধার কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার তুলে ধরেন। এ কারণে লর্ড কার্জন দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রশাসনিক সুবিধা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কাজ শুরু করেন। এর পেছনে বেশ কিছু বাস্তবতা ভূমিকা রাখে। যেমন –

প্রথমত, পূর্ব বাংলা ভারতবর্ষের একটি পশ্চাদপদ প্রদেশে পরিণত হয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি। মুর্শিদকুলী খান আঠারো শতকের প্রথম দিকে ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। ফলে ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও রাজধানীর উপর নির্ভরশীল গোষ্ঠী ঢাকা ছেড়ে সেখানে চলে যান। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুর্শিদাবাদ থেকে শাসনযন্ত্র কলকাতায় স্থানান্তর হয়। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব বাংলা অবহেলিত থেকে যায়। এছাড়া পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যাতায়াত সমস্যা ও প্রদেশের অন্তর্গত প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল, অদক্ষ ছিল। প্রশাসন কার্যকর ও সক্রিয় ছিল না। জনকল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য যে অর্থ এ এলাকায় ব্যয় করা হতো তা ছিল বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলার যোগাযোগ, পুলিশ ও ডাক ব্যবস্থা অত্যন্ত সনাতন প্রকৃতির ছিল। অনুন্নত যোগাযোগ এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ চর ও হাওড় অঞ্চল এবং দ্বীপগুলোতে প্রতিনিয়ত চুরি, ডাকাতি ও বেআইনী কাজ হতো। মানুষের নিরাপত্তা হতো হুমকির সম্মুখীন তাই বঙ্গভঙ্গে প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাও প্রাধান্য পায়।

তৃতীয়ত, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলে'র ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লিখিত একটি চিঠি থেকে বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণ সম্পর্কে জানা যায়। তিনি বলেন, বাংলা সরকারকে বিরাট প্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়াও রাজস্ব আদায়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রসার এবং আরো অনেক জটিল সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। এ সমস্ত দায়িত্ব সূচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দায়িত্ব লাঘব অত্যাবশ্যক ছিল। রিজলে ভৌগোলিক সীমারেখার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রশাসনিক উন্নতির জন্য এ সমস্ত পরিবর্তন যে যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়টি উল্লেখ করেন।

লর্ড কার্জন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নিজেও উপলব্ধি করেন নতুন প্রদেশ গঠিত হলে বাংলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি এগিয়ে যান।

রাজনৈতিক কারণ :

বেশিরভাগ ভারতীয় ঐতিহাসিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে বঙ্গভঙ্গের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুমিত সরকারের মতে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নথিপত্র এবং প্রশাসকদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র স্পষ্টই প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ শাসকরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী একই সুরে বলেছেন, একদিকে বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার প্রয়াস এবং অন্য দিকে বাঙালি জাতির প্রতি অবিমিশ্রিত ঘৃণা থেকেই কার্জন বঙ্গভঙ্গের মতো কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এদিকটা ব্রিটিশ কর্মকর্তরা গোপন রাখার চেষ্টা করেন। যদিও তাদের বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যে তা পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এমনকি লর্ড কার্জনের উত্তরসূরি লর্ড মিন্টো যিনি কার্জনের নীতির ঘোরতর সমালোচক ছিলেন তিনিও স্বীকার করেছেন, "From a political point of view alone, I believe partition to have been very necessary," অবশ্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কয়েকটি লক্ষ্য ছিল। যেমন-

০১. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ধ্বংস করা : ব্রিটিশ শাসিত ভারতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে বিশ শতক শুরু হয়। সম্ভাবনাকে নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত অশুভ বলে চিহ্নিত করেন। এসময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। এর নেতৃত্ব ছিলেন হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ। তাই বাংলাকে বিভক্ত করে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করতে পারলে জাতীয়তাবদী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে বলে ব্রিটিশ আমলারা মনে করতেন। অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ১৯০৩ সালের ২৮ মার্চ একটি চিঠিতে প্রথম এ বিষয়ে মন্তব্য করেন যার থেকে বঙ্গভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি ফাঁস হয়ে যায়। ১৯০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলে আরো পরিস্কার মন্তব্য করে বলেন, "ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি; বিভক্ত বাংলা তা নয়, আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য একে বিভক্ত করা এবং এভাবে আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের দূর্বল করে তোলা।" যদিও কৌশলী কার্জন জনগনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে ধামাচাপা দিয়ে এ লক্ষ্য সফলের জন্য পুরো সময় কাজ করে যান।

Scanned by CamScanner

শেষ পর্যন্ত কার্জনও বিষয়টিতে গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর একটি মন্তব্য থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদিদের প্রতি ক্ষোভ ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে বঙ্গভঙ্গের যৌক্তিকতা তুলে ধরে। তিনি বলেন, "বাঙালি বাবুরা চায় ইংরেজরা তাড়াতাড়ি গুটিয়ে চলে যাক যাতে লাট প্রাসাদে তারা অধিষ্ঠীত হতে পারে। আমরা যদি তাদের হট্টগোলের কাছে নতি স্বীকার করি তাহলে কোনো দিন বাংলার আয়তন হ্রাস বা বঙ্গভঙ্গ করা যাবে না। এ পরিকল্পনা (বঙ্গভঙ্গ) গ্রহণ না করলে আপনি ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে এমন একটি শক্তিকে সংহত সুদৃঢ় করবেন যা এখনই প্রচণ্ড এবং অদূর ভবিষ্যতে যা সুনিশ্চিতভাবেই ক্রমবর্ধমান অশান্তির উৎস হয়ে দাঁড়াবে।"

০২. **বাঙালি ভদ্রলোকদের একাধিপত্য ধ্বংস করা :** ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসী যুক্ত নয়। বরং বৃহৎ অংশ বাঙালি ভদ্রলোকদের প্রতি ব্রিটিশরা বিক্ষুব্ধ ছিল। পূর্ব বাংলা ও আসামের দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ল্যাঙ্গেলট হেয়ারের একটি বক্তব্য থেকেও তাই স্পস্ট হয়। তিনি (৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬) বলেন, বাংলা ভাগ কার্যত বাঙালি ভদ্রলোকদের শ্রেণী শাসন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। এই ভদ্রলোকদের অধিকাংশই ছিল হিন্দুদের তিন উচ্চ জাতি–ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্যের অন্তর্ভুক্ত জমিদার, মহাজন, পেশাদার এবং কেরানী শ্রেণীর মানুষ। অন্য সব সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে এরাই শিক্ষা ও চাকরি-বাকরি পুরোপুরি কুক্ষিগত করে নেয়। এ একাধিপত্যই ছিল তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। কাজেই এসব ভদ্রলোকদের ক্ষমতা খর্ব করার উপায় হলো অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিকাশকে উৎসাহিত করা। এক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের বিকাশকেও লক্ষ্যে রাখা হয়েছে।

০৩. **কংগ্রেসের শক্তি দুর্বল করা :** ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রথমত থেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব নিয়ে যখন ব্যাপক তৎপরতা চলছিল ঠিক সেই মুহূর্তে ১৯০৪ সালের কংগ্রেস অধিবেশন এর বিরূপ সমালোচনা করা হয়। পরিহাস করে কার্জন তখন মন্তব্য করেন, "কংগ্রেস ছাড়া এখন সবাই বঙ্গ বিভাগে রাজি। বঙ্গভঙ্গের ফলে ভবিষ্যতে (ভারতীয় রাজনীতিতে) বাংলার হ্রাসের আশংকাই কংগ্রেসের এই জাতীয় মনোভাবের কারণ।" কার্জন বিশ্বাস করতেন যে, "কলকাতার গুরুত্ব কমিয়ে কর্মকাণ্ডের বিকল্প কেন্দ্রগুলোকে উৎসাহ দিলেই কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়বে।" লর্ড কার্জন এ বিষয়টা গোপন করেননি। ১৯০৫ সালের ২৪ মে তাঁর একটি মন্তব্যই এর সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেন, "the best guarntee of the political advantage of our proposal is its disliked by the party." অর্থাৎ "বাংলা ভাগ যে কংগ্রেসের অপছন্দের এটাই আমাদের বাংলা ভাগ প্রস্তাবের রাজনৈতিক সুবিধার সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা।

০৪. **বিভক্ত ও শাসন নীতি :** অনেক পণ্ডিত বঙ্গভঙ্গকে ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত 'বিভক্ত ও শাসন নীতি'র (Divide and Rule Policy) বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন। তাই এ নীতির দ্বারা তারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করেছিল। বঙ্গভঙ্গও ছিল এই নীতির ধারাবাহিকতা। এর ফলে একদিকে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ জেগে উঠবে এবং তাদের খুশি করা যাবে। তারা সরকারের প্রতি আরো বেশি করে ঝুঁকে পড়বে। অন্যদিকে এ নীতি বাঙলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টি করে এতদিনের গড়ে ওঠা ঐক্য ও সংহতি নস্যাৎ করবে। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বক্তৃতা থেকে এ বিষয় জানা যায়। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার এক জনসভায় লর্ড কার্জন বলেন, "ঢাকা এখন তার পূর্বের ছায়ামাত্র। বঙ্গভঙ্গ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা এসব জেলার জনগণকে তাদের সংখ্যাধিক্য ও উচ্চতর সংস্কৃতির বদৌলতে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট জেলা সমূহে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম করবে এবং পূর্ব বাংলার মুসলামানদের মধ্যে এমন ঐক্য গড়ে তুলবে, যা তারা প্রাচীন মুসলমান সুলতান ও সম্রাটদের আমলের পর কখনো অর্জন করতে পারেনি।" লর্ড কার্জনের এ ভাষণের সারকথা ছিল হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম মানষ জাগিয়ে তোলা এবং কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু প্রধান পশ্চিম বাংলার বিপরীতে নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলাকে দাঁড় করানো।

অর্থনৈতিক কারণ :

০১. **অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা :** কলকাতা ছিল অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র। ভারতবর্ষের রাজধানী হিসেবে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাংলা প্রদেশের সকল প্রকার অর্থনৈতিক বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯০৯ সালে পূর্ব বাংলা ও আসামের আইন পরিষদে বক্তৃতায় সদস্য সৈয়দ শামসুল হুদার বক্তব্যে উঠে আসে এ চিত্রটি। তিনি বলেন, "বাঙলা বিভক্তির আগে বিরাট অংকের অর্থ কলকাতা ও তার আশে পাশের জেলাগুলোতে ব্যয় হতো, শ্রেষ্ঠ কলেজ, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ভারতের রাজধানীর আশেপাশে করা হতো। আর পূর্ব বাংলার মানুষ পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে বছরের পর বছর পুঞ্জিভূত অবহেলা ও বঞ্চনা।" বাঙালি এলিট শ্রেণীভুক্ত লোকদের কলকাতায় অবস্থান একে সর্বভারতীয় মিলনস্থল হিসেবে গড়ে তোলে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকাতয় পূর্ব বাংলা হতে সরবরাহকৃত কাঁচামালের বদৌলতে কলকাতার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের অবহেলা, উদাসিনতা ও ফলপ্রসু প্রকল্পের অভাবে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যায়। ফলে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

Scanned by CamScanner

০২. **জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুক্তি :** পূর্ব বাংলার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। এখানে জমিদারি ব্যবস্তা থাকলেও জমিদাররা কলকাতায় অবস্থান করতেন। তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের নিযুক্ত লোকজন নিরীহ পূর্ব বাংলার কৃষকদের উপর শোষণ চালাতো। আর এর সুফল ভোগ করত কলকাতাবাসী জমিদারগণ। জমিদারদের আরাম-আয়াসের জন্য ব্যায়িত অর্থ সংগ্রহ করা হতো পূর্ব বাংলায় কৃষকদের কাছ থেকে। পূর্বের অর্থ এভাবে পশ্চিমে ব্যয় হতো। কৃষকদের উপর জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারের শোষণ নীতির ফলে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের জীবনে যে কালো ছায়া দেখা দেয়, সেটাই অবহেলিত পূর্ব বাংলাবাসীদের বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে।

০৩. **পাটের ন্যায্য মূল্য লাভ :** পূর্ব বাংলার অর্থকরী ফসল পাট। কিন্তু পূর্ব বাংলায় পাটকল তৈরি না করে বেশির ভাগ কলকাতার হুগলি নদীর তীরে গড়ে তোলা হয়। এর ফলে পাটের প্রকৃত মূল্য থেকে যেমন পূর্ব বাংলা বঞ্চিত হয় তেমনি শিল্প পূর্ব বাংলায় গড়ে না তোলায় বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়ে যায়।

০৪. **চাকরি লাভের আশা :** তৎকালে সরকারি চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকায় পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। অধ্যাপক রফিউদ্দিন আহমেদ তাঁর গবেষণায় চাকরির ক্ষেত্রে ১৮১৭ সালের একটি হিসেবে দেখিয়েছেন যে, বাংলায় মুসলমান কর্মচারী ছিল মোট চাকরিরতদের ৫.৯ শতাংশ। অন্যদিকে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪১ শতাংশ। এ হিসেব থেকে মুসলমানদের প্রতি সরকারি অবহেলার চিত্র ফুটে উঠে। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে এবং নিজেদের আর্থিক উন্নতির আশায় তারা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলনে যোগ দেন।

০৫. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও বন্দর সুবিধা অর্জন :** পূর্ব বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল চরমভাবে অবহেলিত। চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে আসাম ও পূর্ব বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের যে প্রসার হতে পারতো সেদিকে সরকারের দৃষ্টি ছিল না। বাংলাদেশের বড় বড় নদীগুলোকে যেমন– মেঘনা নদীকে বড় জাহাজ চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হয়নি। কলকাতার সঙ্গে উত্তর-পশ্চির, ভারতের রেল যোগাযোগের উন্নতির জন্য উত্তর-পশ্চিম রেলপথ তৈরি করা হলেও পূর্ব বাংলার সঙ্গে রেলপথে যোগযোগ ছিল অবহেলিত। ঢাকা বিভাগ থেকে গণপূর্ত কাজের জন্য ৬ লক্ষ টাকা তোলা হলেও তা ব্যয় করা হয়েছে কলকাতা, উড়িষ্যা ও বিহারে। বাণিজ্য কেন্দ্র ঢাকা বিভাগের সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিও করা হয়নি। চট্টগ্রামের উন্নতি হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে কলকাতার গুরুত্ব হ্রাস পাবে। এ আশংকায় কলকাতা কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণে কোনো চেষ্টাই করেনি। বঙ্গভঙ্গের পেছনে কার্জন যে অর্থনৈতিক সুবিধার কথা উল্লেখ করেন তাতে আসামের চা বাগানের মালিক, তেল ও কয়লা শিল্পপতিদের কম খরচে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সমুদ্রে বাণিজ্যের কথাও উল্লেখ করা হয়। উত্তর পূর্ব ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ আসাম-বাংলা রেলপথকে একটি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়ও প্রাধান্য পায়। যদিও সুমিত সরকারের মতে, এসব যুক্তির মধ্যে ফাঁক ছিল। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে যে পূর্ব বাংলার উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে পূর্ব বাংলাবাসীদের অসন্তোষকে ঘনীভূত করেছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ :

ইংরেজ শাসনের শুরু থেতে তাদের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য হারাতে থাকে। ফলে ১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ তাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব জোরালোভাবে সমর্থন করে। তাছাড়া অনেক আগে থেকেই পূর্ব বাংলায় মুসলমান এবং পশ্চিম বাংলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য লক্ষণীয় ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, প্রত্যেকে তাদের স্বধর্মের মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইবে, সেজন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ে স্বাধীনতা তথা মুক্ত পরিবেশ। বলাবাহুল্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে হিন্দু জমিদার ও প্রভাবশালীদের হাতে বাধাগ্রস্ত হতো। এজন্যে নতুন প্রদেশে নিজেদের জীবনদর্শন অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের মধ্যে যে জাগরণ দেখা দেয়, তা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। এছাড়া অধিকার বঞ্চিত মুসলমানদের দাবি আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন মনীষীর সোচ্চার আবেদন তাদেরকে আত্মসচেতন করে তোলে। ফলে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এই এলাকার মুসলমানদের মধ্যে ক্রমে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন :

লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ নিয়ে (দার্জিলিং বাদ দিয়ে, কিন্তু মালদহ ও পার্বত্য ত্রিপুরা জেলা অন্তর্ভুক্ত করে) 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ' গঠিত হয়। এই নতুন প্রদেশের আয়তন ১০৬৫০৪ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু। পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকা। এই প্রদেশের জন্য একজন ছোট লাট, একটি ব্যবস্থাপক পরিষদ ও একটি রাজস্ব বোর্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম ছোট লাট (গভর্নর) নিযুক্ত হন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী কলকাতা। এর আয়তন ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ। এর মধ্যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু, ৯০ লক্ষ মুসলমান এবং বাকি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়।

Scanned by CamScanner

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল :

১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসামের ইরা পত্রিকায় প্রদেশ প্রতিষ্ঠার ফলে ৮টি সুবিধার কথা উল্লেখ করে। এগুলো হচ্ছে- ১. ঢাকা নগরের পুনর্জন্ম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি; ২. নদী ও খালগুলোর উন্নতি, রেল লাইনের সম্প্রসারণ এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে এর সংযোগ স্থাপন; ৩. নতুন প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হওয়ার ফলে জমিদার ও শিক্ষিত ম্যবিত্ত আকর্ষণ করার সুযোগ-সুবিধা; ৪. সুষ্ঠু শাসন ও জনসাধারণের জান মালের অধিকাতর নিরাপত্তা; ৫. পূর্ব বাংলার শিক্ষিত ও সভ্য লোকদের সংস্পর্শে আসায় অনুন্নত আসামের অধিবাসীদের উপকার; ৬. পূর্ব বাংলার জন্য কর্মদক্ষ পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থা; ৭. প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি; ৮. এক বছরের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে, জনসাধারণ এখন প্রদেশের প্রধান কর্মকর্তার সংস্পর্শে আসতে পারে যা পূর্বে কখনো সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত সুবিধাগুলো পূর্ব বাংলা লাভ করে। আরো কয়েক ভাগে আমরা বঙ্গভঙ্গের ফলাফল বিচার করতে পারি।

রাজনৈতিক ফল :

প্রথমত, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও নতুন প্রদেশ গঠন পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ ও রাজনীতিতে প্রাণচঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে রাজধানী ঢাকায়। গড়ে ওঠে নতুন অফিস, সচিবালয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রশাসনের প্রতিটি শাখায় নতুন প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। লর্ড কার্জনের মতে, "The New province advanced in educaction, in good government, in every mark of prosperity." নতুন প্রদেশের অবকাঠামোগত ও বাস্তব উন্নতি হয়।

দ্বিতীয়ত, নবগঠিত প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তীব্য হয়ে উঠে। এসময় প্রদেশের মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দুদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি প্রতি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্তরের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার দিকে দৃষ্টি দেয়। বঙ্গভঙ্গের প্রথমবার্ষিকী মুসলমানরা পালন করে উৎসবমুখর চিত্তে। অন্যদিকে হিন্দুরা একে শোক ও বেদনার দিন হিসেবে পালন করে। এর ফলে সমাজে নৈরাজ্যের ও সন্ত্রাসের আবির্ভাব ঘটে। বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় যাতে অনেক প্রাণহানি ঘটে।

তৃতীয়ত, মুসলমানদের নিজস্ব দল মুসলিম লীগ গঠন (১৯০৬) বঙ্গভঙ্গের অপর রাজনৈতিক ফল। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার ব্যাপক মানুষের সমর্থনে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে পূর্ব বাংলার নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে ব্রিটিশ শাসকদের জন্য উক্ত নবাবদের মাধ্যমে বাংলার জনসাধারণকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত করার উদ্যোগ সহজে সফল হয়। ঢাকার বিভেদ নীতিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করতে এগিয়ে আসার মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের মুসলমানদের ওপর তাদের নেতৃত্ব সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কারণে মুসলিম লীগ গঠিত হয় নবাব সলিমুল্লাহর আহ্বানে এবং ঢাকায়। এ দলের চাপের কারণেই মর্লি-মিন্টো ১৯০৯ সালে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেন।

সামাজিক ফল :

বঙ্গভঙ্গের আগে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হলেও তা ধীরে গতিতে হয়েছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, পরের বছর মুসলিম লীগ গঠনের পর হিন্দুদের বিরোধিতার কারণে মুসলিম জাতীয়তাবাদ আরো চাঙ্গা হয়। ১৯০৫-১৯১১ সাল পর্যন্ত শিক্ষা, চাকরি কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে মুসলিম মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতোদিন অভিজাত সম্প্রদায় থেকেই শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে গ্রামীণ উদ্বৃত্ত কৃষক পরিবারকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত করে। এরাই রাজনীতি, সমাজ ও শিক্ষা সাহিত্য চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ফল :

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই প্রাদেশিক সরকার সংস্কারের উদ্যোগ নেয় এবং উন্নয়ন সাধন করে। ১৯০৬ সালের মে মাসে প্রাদেশিক সরকার মুসলিম কর্মচারি সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশ দেয় এবং পরে কোটা পদ্ধতি চালু করলে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সালের ভেতর গোটা বাংলায় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব বাংলার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮২.৯ ভাগ যা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোচ্চ। অন্য একটি হিসেব থেকে জানা যায় যে, ১৯০১-১৯০২ সালে বাংলায় মোট মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩,৩১,৯০০ জন, ১৯১১-১২ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ৫,৭৫,৬৬৭ জনে উন্নীত হয়। নারী শিক্ষারও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। ১৯০৮-০৯ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৫৫০-এ এসে দাঁড়ায় এবং ছাত্রী সংখ্যা ১,৩২,২৩৯ জনে উন্নীত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর উন্নতি পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

অর্থনৈতিক ফল :

প্রথমত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফল ছিল আশাব্যঞ্জক। এসময় ব্যাপকভাবে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে পাটের দামও বেড়ে যায়। ১৯০৬-১৯০৭ সালে পাটের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৪ সালের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এর ফলে পূর্ব বাংলার কৃষকদের হাতে বাড়তি আর্থ আসতে থাকে। সন্দেহাতীতভাবে কৃষকদের কাছে তা বঙ্গভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই ধরা পড়ে যা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনে ভূমিকা রাখে। এভাবে উদ্বৃত্ত অর্থ এবং শিক্ষিত শ্রেণীর নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগের কারণে কৃষক ও শিক্ষিত মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে রফতানি বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি হয়। এক হিসেবে দেখা যায় যে, প্রথম বছরে বৈদেশিক বাণিজ্য ২,৯৮,২৭,৩৯৭ থেকে ৩,১৭,৭৭,৮৪৬ টাকায় উন্নীত হয়, যা পূর্বের চেয়ে ১৯,৫০,৪৪৯ টাকা বেশি। আমদানি ও রফতানি উভয় বাণিজ্যেই এ বৃদ্ধি ঘটে। প্রদেশের সমুদ্র নির্ভর বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯০৫-১৯০৬ অর্থ বছরে এই বন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩১৭.৭৬ লক্ষ টাকা।

তৃতীয়ত, প্রদেশের দুর্দশাগ্রস্ত পরিবহনের উন্নয়নের দিকেও নতুন প্রশাসন দৃষ্টি দেয়। যদিও এ খাতে অধিকাংশ ব্যয় ধরা হয় পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চাদপদ আসামে। প্রদেশের রাস্তাঘাটের জন্য ১৯১১ সালে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া :

০১. **মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু ও বর্ণ হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া :** ১৯০৩ সারের শেষ দিকে প্রথম বারের মতো বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পর পরই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। তবে বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হলে হিন্দু সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কলকাতাকেন্দ্রিক সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু ও বর্ণ হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা বিশেষ করে জমিদার, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও সাংবাদিক সবাই এ আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নেন। তারা বঙ্গভঙ্গকে বাঙালি বিরোধী, জাতীয়তাবাদ বিরোধী ও বঙ্গ মাতার অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করেন। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মন্তব্য করেন, বাংলা বিভাগ করে হিন্দুদের অপমান ও অপদস্ত করা হয়েছে। তারা মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্ব এবং মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বলে একে সাম্প্রদায়িক রূপ দেন। বর্ণ হিন্দুরা ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে কাশিমবাজারের জমিদার মহারাজা মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভাস্থল ছাড়িয়ে লোক সমাগম নিকটস্থ ময়দান এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং পত্র-পত্রিকায় দাবী করা হয় এক লক্ষ লোক এতে অংশ নেয়। সভাপতির বক্তৃতায় মহারাজা বলেন, নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগুরু আর বাঙালি হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। ফলে আমরা নিজ দেশে হবো প্রবাসী। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবীরা একে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর আঘাত বলে মনে করেন। রাজীনীতিবিদদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দু ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখ।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের বিরোধিতার প্রধান কারণ ছিল স্বার্থগত। ঢাকায় নতুন প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হলে নতুন প্রদেশে শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে, নতুন পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম হলে কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া ব্যবসার বিঘ্ন ঘটার আশংকায় তারা এর বিরুদ্ধে ছিলেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ক্যালকাটা বেলড জুট অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি ব্যবসায়ী সংগঠন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করে ও প্রতিবাদলিপি পাঠায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, আইনজীবি, সাংবাদিকরাও অনুরূপ কারণে ছিলেন। বিশেষ করে আইনজীবীরা মনে করতেন ঢাকায় নতুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের আইন ব্যবসায় ভাটা পড়বে। কারণ তাদের বেশির ভাগ মক্কেলই পূর্ব বাংলার।

০২. **কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া :** হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রতিবাদ সভার প্রত্যেকটিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অংশ নেন এবং বঙ্গ বিভক্তি বাতিলের দাবি জানান। কংগ্রেস অসাম্প্রাদায়িক দল হওয়া সত্ত্বেও এ আন্দোলনে যোগ দেয়ায় অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেসের যে পরিচয় ছিল তা ক্রমশ লোপ পায়। যদিও বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসে বাংলা ভাষী হিন্দুদের মানসিকতাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয় এবং একটি একটি শক্তিশালী হিন্দু সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার আগের বছর ১৯০৪ সালে বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে বাঙালির জাতিসত্তাকে খণ্ডিত করার পরিকল্পনা বলে অভিহিত করা হয়। আন্দোলন জোরদার করার জন্য বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দু'মাস আগে ৭ আগষ্ট কলকাতার এক জনসভা থেকে কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেয়। কংগ্রেসী হিন্দুদের এই বিক্ষোভ শুরুতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও তা বঙ্গভঙ্গের সমর্থক বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

০৩. **হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের সূত্রপাত :** ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন হিন্দু সম্প্রদায় শোক দিবস পালন, অনশন, সব ধরনের কাজ বর্জন, খালি পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নানে যায়। এর আগে ২২ সেপ্টেম্বর বাঙালির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক 'রাখিবন্ধন' বা হাতে লাল ফিতা ধারণ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন কর্মসূচীর নেতৃত্ব দেন। বাংলার হিন্দুরা প্রচার করতে থাকে যে, বঙ্গভঙ্গ অর্থ বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ এবং এটি দেবী কালীর প্রতি অপমানে শামিল। হিন্দু ধর্মে কালী মাতৃভূমির প্রতীক। তাই বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা 'বন্দেমাতরম'কে তাদের জাতীয় শ্লোগান ও জাতীয় সংগীতে রূপ দে। আন্দোলনকারীরা মুসলিম বিদ্বেষমূলক এই সংগীতকে চালু এবং সভা সমিতিতে এ সংগীত ব্যাপক ব্যবহার করায় মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে। ফলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ক্রমে মুসলিম মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে। ফলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ক্রমে মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। বাংলা ও বাংলার বাইরে আন্দোলন ক্রমে মুসলিম বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়। এর ফলে সাম্প্রাদায়িক সম্প্রীতী হুমকির সম্মুখীন হয়। কুমিল্লা, ঢাকা ফরিদপুর, জামালপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, পাবনাসহ পূর্ব বাংলার বহু স্থানে ১৯০৬-১৯০৭ সালে দাঙ্গা হয়। এসব দাঙ্গায় বহু লোক হতাহত হয়। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গভঙ্গের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে কংগ্রেস ও হিন্দুরা শোক দিবস হিসেবে পালন করে।

Scanned by CamScanner

০৪. **সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া :** কলকাতার অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার মালিক ছিলেন তখন মধ্যশ্রেণীর বা জমিদার। তারা চিন্তা করেছিলেন নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে নতুন নতুন পত্র- পত্রিকা প্রকাশিত হলে তাদের ব্যবসা ও প্রভাব ক্রমশ কমে যাবে। এ কারণে হিন্দু মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভূমিকা পালন এবং ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পরিচালনায় বেঙ্গলি পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে এক 'গুরুতর জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে' চিহ্নিত করে। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সম্পাদিত সঞ্জীবনী পত্রিকা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বয়কটকে সমর্থন করে। হিতবাদী পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের কঠোর সমালোচনা করা হয়। এছাড়া ভূপেন্দ্রনাথ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'যুগান্তর' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে এবং স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন দেয়। মতিলাল ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে খুবই সোচ্চার করে। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট টাউন হলের সভার পরের দিন ৮ আগস্ট পত্রিকাটিতে মন্তব্য করা হয় "The 7th of August was the birthday of Indian nationalism. Nationalism means two things the self consecration to the gospel of national freedom and practice of Independence. Boycott is the practice of Independence." ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা নামে একটি দৈনিক পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করতো। শহর, উপশহর, গ্রাম ও গঞ্জের স্বল্প শিক্ষিত মানুষের কাছে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

০৫. **স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত :** বঙ্গভঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়ার আগেই এর বিরুদ্ধে ব্যাপক কর্মসূচি দেয়া হয়। ১৯০৫ সালের ১৭ জুলাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বয়কট, বিলেতি পণ্যে অগ্নিসংযোগ ও ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯০৫ সালের ৭ আগষ্ট কলকাতা টাউন হলে স্বদেশী আন্দোলন ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গবঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বদেশী আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। বাংলা ছাড়াও যুক্ত প্রদেশের ২৩ টি জেলায়, মধ্য প্রদেশের ১৫০ টি শহরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ২৪ টি শহরে, পাঞ্জাবের ২০ টি জেলায় ও মাদ্রাজের ১৩ টি জেলায় এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনকে তাই কেউ কেউ 'বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করেন। উইল ডুরান্ট বলেন, "It was in 1905, then: that the Indian Revolution began." এ আন্দোলনই পরের বছর (১৯০৬) স্বরাজ বা বিদেশি শাসনের অবসান একমাত্র দাবিতে পরিণত হয়। ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বরে বিপিন চন্দ্র পাল নির্দ্বিধায় বলেন, "Our ideal is full freedom, which means absence of all foreign control." মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং ১৯০৮ সালে মন্তব্য করেন, "বঙ্গভঙ্গের পরই ভারতের প্রকৃত জাগরণ ঘটেছে। এই বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশ সামাজ্যের বিভক্তির কারণ হবে।" আন্দোলনের তীব্রতা সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি করে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা প্রকটরূপ লাভের কারণে ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে ১৯০৬ সালে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর ফুলার পদত্যাগে বাধ্য হন।

০৬. **নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া :** উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সকলে বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করলেও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বিশেষ করে নমঃশূদ্ররা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। পূর্ব বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নমঃশূদ্র ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলা ও আসামের নমঃশূদ্ররা ছিল বিশ লাখ। শেখর বন্দোপাধ্যায় উল্লেখ করেন যে, তখন ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩২.৬২%, এর মধ্যে নমঃশূদ্র ছিল ১৬.৫%। যশোর ও খুলনার মোট হিন্দু জনসংখ্যার ১৩.৭৮% ছিল নমঃশূদ্র। পূর্ব বাংলায় হিন্দু কৃষকদের শতকরা ৯০% ছিল নমঃশূদ্র। হিন্দু ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও কায়স্থদের ঘৃণার ফলে তারা ছিল অনগ্রসর। বর্ণ হিন্দুদের রাজনৈতিক অভিলাষের মধ্যে তারা কোন স্বার্থ খুঁজে পায়নি, তাই তারা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে। বাখেরগঞ্জ ও ফরিদপুরের নমঃশূদ্ররা বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে তাদের জোড়ালো মতামত ব্যক্ত করে।

০৭. **মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া :** কিছু ব্যতিক্রমবাদে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সিংহভাগ ছিল বঙ্গভঙ্গের পক্ষে। ১৯০৩ সালের প্রস্তাবিত বঙ্গ বিভক্তিকে সবাই এমনকি মুসলমানরাও বিরোধিতা করেছিল। স্বয়ং নবাব সলিমুল্লাহ তখন এর বিরোধিতা করেন। যদিও লর্ড কার্জনের ১৯০৪ সালে পূর্ব বাংলা সফর এবং সংশোধিত বিভক্তিকে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাগত জানায়। কতিপয় জমিদার ও আইনজীবী ছাড়া পূর্ব বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠি যাদের সিংহভাগ মুসলমান তারা এর পক্ষে ছিল। ১৯০৫ সাল থেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যখন প্রবল আন্দোলন শুরু হয় তখন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। ১৯০৬ সালে তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় 'মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের রাজনৈতিক দল। এ দলটি জন্মলগ্ন থেকেই বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন দেয়। নব গঠিত প্রদেশটি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদেও সমর্থন লাভ করে। নতুন প্রদেশ গঠনের পর মুসলিম পত্র-পত্রিকা একে স্বাগত জানায়। এছাড়া মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, মুসলিম সাহিত্য সমিতি, মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন নামে মুসলমান সংগঠনগুলোও একে সমর্থন দেয়। মুসলিম সাহিত্য সমিতি ১৯০৫ সালেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এই ঘোষণাপত্রে মুসলমানদের কাছে আবেদন জানানো হয় যে, তারা যেন স্বদেশী বা অন্য নামে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় যোগ না দেন। এভাবে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজে বঙ্গভঙ্গ ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

অবশ্য শিক্ষিত মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশ বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে ছিলেন। তবে তাদের বেশির ভাগ কলকাতায় বসবাসকারী ভূস্বামী এবং কংগ্রেসপন্থী রাজনীতিবিদ। তাঁদের মধ্যে খাজা সলিমুল্লাহর সৎভাই খাজা আতিকুল্লাহ, ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল, ইসমাইল চৌধুরী, লিয়াকত হোসেন, সৈয়দ খাজা আলাউদ্দিন, আবদুল হালিম গজনবী, গোলাম মাওলা, কাজেম আহমেদ সিদ্দিকী, সৈয়দ মুহাম্মদ দিদার বক্স, সৈয়দ আহাম্মদ আকবর, আবুল কাশেম, আবুল হোসেন, মুহাম্মদ ইউসুফ, আলী মুজ্জামান চৌধুরী, লিয়াকত আলী, আবদুল গাফফার, আবুল হোসেন, দীন মোহাম্মদ, ইসলমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে ভূমিকা রাখেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিল ভারতীয় মুসলমান সমিতি।

Scanned by CamScanner

ঢাকার মুসলিম সমিতির অধিবেশনে সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঘোষণা করেন, "ভারতের হিন্দু-মুলমান এক বৃন্তে দুটি ফুল বা একই দেহের অঙ্গান্তর মাত্র।" কলকাতা থেকে প্রকাশিত The Mussalman বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। তবে সামাজিক মর্যাদা, সাংগঠনিক প্রতিভার দিক থেকে তাঁরা কেউ বঙ্গভঙ্গের পক্ষের নেতা নবাব সলিমুল্লাহ বা নবাব নওয়াব আলি চৌধুরীর সমকক্ষ ছিলেন না। বাংলার অধিকাংশ মুসলমান জনগণকে তারা আদৌ প্রভাবিত করতে পারেননি। বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিল। তারা বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি প্রত্যক্ষ বিরোধী না হলেও উদাসীনতার নীতি অনুসরণ করে।

বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) :

বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট স্বদেশী, বয়কট আন্দোলন তীব্র সন্ত্রাসবাদী রূপ নিলে ব্রিটিশ সরকার সমস্যার মুখোমুখি হয়। এছাড়া হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলা থেকে ভারতে বহু স্থানে ছড়িয়ে পড়লে ব্রিটিশ সরকার নতুনভাবে এ বিষয়ে ভাবনায় পড়ে। ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের শাসন বিভাগে দুটি পরিবর্তন দেখা দেয়। ভারত সচিব হয়ে আসেন লর্ড ক্রিউ এবং বড় লাট হন লর্ড হার্ডিঞ্জ। বড়লাট ঘোষণা করেন, ব্রিটিশ রাজ ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে এসে দিল্লিতে এক দরবার করবেন। সেজন্য কংগ্রেস নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি আপোস নীতি গ্রহণ করেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। ১৯১১ সালের ২৫ আগষ্ট বড় লাট ভারত সচিবের কাছে এক গোপন বার্তায় ভারতের প্রশাসনে কতিপয় পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। এই পরিবর্তনের মধ্যে প্রথমত, ভারত সরকারের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়। এর সুবিধা হিসেবে বলা হয় যে, এর ফলে কলকাতা সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। অন্যদিকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর হলে উত্তর ভারতের মুসলমানরা খুশি হবে। কেননা দিল্লি এক সময় মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তন হিসেবে বলা হয় ৫ টি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ যেমন- প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, ঢাকা, রাজশাহী ও কুমিল্লাকে একত্রিত করে প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলাদেশ থেকে পৃথক করা হয়। নতুন প্রদেশের জনসংখ্যা হয় ৪ কোটি ২০ লক্ষ এবং আয়তন ৭০ হাজার বর্গমাইল। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। নতুন ব্যবস্থা ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কার্যকরহয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ :

০১. **সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ :** বঙ্গভঙ্গের আগে থেকেই হিন্দুদের বড় অংশ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে হিন্দু রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র মালিক শ্রেণী এর বিরোধীতা করেন। তারা বঙ্গভঙ্গকে মাতৃভূমি বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জাগিয়ে তোলে। এসব কর্মসূচি থাকার ফলে স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ বলতে গেলে ছিলই না। ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমান্বয়ে সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়।

০২. **কংগ্রেসের বিরোধিতা :** ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর প্রত্যেকটি অধিবেশন ও জনসভায় দলটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করে। মূলত ১৯০৫ সালের ৭ আগষ্ট কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে হিন্দুরা সর্বাত্মক আন্দোলনে অংশ নেয়। এই ইস্যুতে কংগ্রেস হিন্দুদের সমর্থকে পরিণত করে। এভাবে বঙ্গভঙ্গকে কংগ্রেস হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। মুসলমানরা কংগ্রেস ও তার জাতীয়তাবাদী ঐক্যের আদর্শকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং অনেকে দল ত্যাগ করেন। তাসত্ত্বেও কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভূমিকা এবং ব্রিটিশ সরকারকে তা রদের জন্য বহুমুখী চাপ অব্যাহত রাখে। ১৯১১ সালের জুন মাসের সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বাংলার ১৮টি জেলার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য ভারতের নতুন বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে চরমপত্র দেন। হার্ডিঞ্জ এর পর পর বঙ্গভঙ্গ রদ চূড়ান্ত করেন।

০৩. **স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসী তৎপরতা :** বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার আগেই কংগ্রেসের নেতৃত্বে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেয়। বিলেতি পণ্য বয়কটের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি ছিল বয়কট কর্মসূচির উদ্দেশ্য। এর ফলে বিলেতি কলকারখানা ও মিল ফ্যাক্টরিগুলোতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে ভাবতে থাকে। এমনকি ব্রিটিশ বণিকগণ সরকারের উপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। তবে স্বদেশী আন্দোলনের এক পর্যায়ে গঠিত গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা, বিচারক, ইংরেজ শাসকদের হত্যার চেষ্টা চালায়। কিংসফোর্ড কে হত্যার দায়ে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীসহ অনেকের ফাঁসি হলেও এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকে যা ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদ নিয়ে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে।

০৪. **ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব :** তড়িৎগতিতে বঙ্গভঙ্গ চালুর পর ব্রিটেনে সরকারি মহলে মতদ্বৈততার শেষ ছিল না। সরকারের সঙ্গে অনেকটা মতদ্বৈততার কারণে ১৯০৫ সালের শেষ দিকে লর্ড কার্জনকে ভারত থেকে প্রত্যাহার করা হয়। ন'মাসের মাথায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর বামফিল্ড ফুলার। অবশ্য বিপ্লবীদের প্রতি ফুলারের কঠোর নীতি যেমন-জনসভা ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বন্দেমাতরম শ্লোগানে নিষেধাজ্ঞা জারির কারণে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে ভীষণ অজনপ্রিয়ও হয়ে ওঠেছিলেন। ফলে সরকারের সঙ্গে ফুলারের ব্যবধান বাড়তে থাকে। এমনকি ১৯০৬ সালের এপ্রিলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে তাঁর গৃহীত কার্যক্রম ভারত সরকার প্রত্যাখ্যান করে।

Scanned by CamScanner

বড় লাট লর্ড মিন্টো ফুলারের প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট ছিলেন না যা তাঁর একটি মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন "Fuller, the Lieutenant Governor, though a pleasant man to talk to, does not at all impress me as likely to take a level headed course of action, and there has been very stupid mismanagement there lately." ফুলারের স্থলাভিষিক্ত লেনসলট হেয়ার ছিলেন ফুলার বিদ্বেষী। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর কঠোর নীতির কারণে তিনিও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অজনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। লর্ড মিন্টোর সঙ্গে তাঁরও মতদ্বৈততা শুরু হয় এবং ১৯০৮ সালে ভাইসরয় মিন্টো হেয়ার সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। পদত্যাগের ২ বছর পর ১৯০৮ সালের ৬ জুন ফুলার Jaccuse ছদ্মনামে দি টাইমসে এক নিবন্ধে ব্রিটিশ সরকারের পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ নীতির সমালোচনা করেন। সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি এবং ভারতের জনসংখ্যার বড় অংশ হিন্দুদের অসহযোগিতার কারণে ব্রিটিশ সরকার নতুন প্রদেশের ব্যাপারে আগ্রহ হারাতে থাকে। মূলত ১৯১০ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদের গোপন তৎপরতা চালায় যা ১৯১১ সালে ঘোষণার মাধ্যমে বাস্তব রূপ পায়। এভাবে ভারতবর্ষের কিছু মধ্যবিত্ত ও পুঁজিপতি শ্রেণীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কাছে ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করে।

০৫. মুসলিম লীগের দুর্বলতা : সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গকে সভা-সমিতির মাধ্যমে সমর্থন জানালেও এর সাংগঠনিক ভিত ছিল খুব দুর্বল। কংগ্রেস যেভাবে হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতায় ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল সে ধরনের কোনো কর্মসূচী মুসলিম লীগের ছিল না। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনের পর বিভিন্ন সভা সমিতিতে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বক্তব্য দেয়া হলেও দলের কোনো সাংগঠনিক কর্মসূচি এ সম্পর্কে ছিল না। ১৯০৮ সালে মুসলিম লীগের নতুন নেতৃত্বে আসেন নতুন কিছু মুখ, যারা দলকে সংগঠনিকভাবে ধীর গতিতে এগিয়ে নেন। যে কারণে বঙ্গভঙ্গ মুসলিম লীগের নেতাদের বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকে, কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মসূচির মতো বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে তারা ব্যর্থ হন। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের চাপে মত পরিবর্তন করলেও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে তাদের সে ধরনের চাপ ছিল না।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া :

০১. হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া: বঙ্গভঙ্গ রদে হিন্দুরা সন্তোষ প্রকাশ করে। জাতীয় কংগ্রেস একে স্বাগত জানায়। কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকাচরণ মুজমদার ব্রিটিশ সরকারকে অভিনন্দন জানান। হিন্দু উগ্রপন্থীরা একে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করে। এমনকি কংগ্রেসের ইতিহাস লেখক পট্টভি সীতারাময় লিখেছেন, "১৯১১ সালে কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদ করে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনে ন্যায়নীতির পরিচয় দিয়েছে।"

০২. মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া : মুসলমানরা এতে আহত হয়। তারা বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে হতাশা দেখা যায়। শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানরা এতে উদ্বিগ্ন হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের যে ধারা চালু হয়েছিল এর ফলে মুসলমানরা তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকায় ক্ষুব্ধ হয়। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তারা আস্থা হারিয়ে ফেলে। মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা যারা এতোদিন ব্রিটিশ সরকারের প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিলেন তারা সরকারের সমালোচনায় নামেন। নবাব ভিকার-উল-মূলক তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে ভবিষ্যতে মুসলমানগণ সরকারের কথা ও কাজের উপর আস্থা রাখতে পারবে না। মওলানা মোহাম্মদ আলীও একই সুরে বলেন, মুলসমানদেরকে তাদের রাজভক্তির প্রতিদানে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের কারণে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হন নবাব সলিমুল্লাহ। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করে বলেন, "বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে আমরা যে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলাম তা আমাদের বিরাট দুঃখের কারণ। কিন্তু আমাদের দুঃখ আরো বেশি তীব্র হয়ে ওঠে যখন দেখি সরকার আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করে কোনো পূর্বাভাষ না দিয়েই এই পরিবর্তন বাস্তবায়ন করলেন।" বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার পর পর ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহর আহবানে উভয় বাংলার নেতৃস্থানীয়দের এক সভায় স্বয়ং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মুসলিম নেতা আবদুর রসুল, মৌলভী আবদুল মজিদ, খাজা আতিকুল্লাহ অংশ নেন। ব্যারিষ্টার রসুল পরে মুসলিম লীগে যোগ দেন। সভায় ভাইসরয়ের কাছে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একটি স্মারকলিপি উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে আরো পরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনের জন্য মুসলিম লীগ মুসলমানদের মুখপাত্রে পরিণত হয়। শুধু পূর্ব বাংলায় নয় ১৯১২ সালে বঙ্গীয় মুসলিম কলকাতায় গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এ দলই পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়। এমনকি এর পর পর সলিমুল্লাহ স্বেচ্ছায় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯১৫ সালে তিনি মারা যান।

০৩. মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিবর্তন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব গ্রহণ : বঙ্গভঙ্গ রদের সাথে সাথে মুসলিম লীগের নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর নেতৃত্বে ঢাকার নবাব পরিবার, ধানবাড়ির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, চট্টগ্রামের সৈয়দ শাসমুল হুদা, টাঙ্গাইলের স্যার এ.কে. গজনবীসহ নেতৃত্ব অভিজাত ও জমিদারদেও মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের অন্ধ অনুগত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদের পর মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও যুব সম্প্রদায় এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এ শ্রেণী নিছক সাম্প্রদায়িকতার নয় বরং শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্যে, পেশায় উৎকর্ষতার মাধ্যমে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, এ.কে.ফজলুল হকের নেতৃত্বে অসাম্প্রাদায়িক নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ আনুগত্যের বদলে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন। এ.কে.ফজলুল হক ১৯১২ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরের বছর এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক পরিষদে বঙ্গভঙ্গ রদের সমালোচনা করেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে পরিষদে বলেন, মুসলমানদের দাবির প্রতি উপক্ষো করা হলে বিপদের সম্ভবনা আছে। বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিম লীগ নেতা সৈয়দ শামসুল হুদা এর প্রতিবাদ করলেও শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় তাঁর বক্তৃতাকে 'বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা' বলে মনে করেন।

Scanned by CamScanner

০৪. হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা : নতুন মুসলিম লীগ নেতৃবন্দ হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিদ্বেষ নয় বরং সহযোগিতার পক্ষে ছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাদের মনোভাব পরিবর্তন করেন। ১৯১৩ সালের লক্ষ্মৌতে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের জন্য স্বরাজ দাবি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে এ উদ্দেশে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ডাকও দেয়া হয়। ফজলুল হক মুসলিম লীগের নেতা হয়েও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রসে যোগ দেন এবং ১৯১৪ সালের মেদনীপুরে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ব্যারিষ্টার আবদুর রসুলসহ অনেক নেতার সহযোগিতায় তিনি হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। এখানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যুক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে আলোচনায় স্থির হয়, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে এ দুই রাজনৈতিক দল ব্রিটিশ সরকারের কাছে যুক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করবে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার নীতির প্রশ্নে একটি সমঝোতায় আসে যা 'লক্ষ্মৌ চুক্তি' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে উভয় দল ভারতে হিন্দু-মুললিম ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি এবং অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হয়।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া : মুসলমানদের অসন্তোষ ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। বঙ্গভঙ্গ রদের পরের মাসেই (১৯১২ সালের জানুয়ারি) বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। ৩১ জানুয়ারি ঢাকায় পূর্ব বাংলার মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁদের আশ্বাস দেন যে, নতুন প্রশাসনে ভারত সরকার ২ ফেব্রুয়ারি এক ইশতেহারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করে। ড.রাসবিহারী ঘোষসহ হিন্দু নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংস্থা গঠন করেন। এর সফল পরিণতিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে এ দেশের রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এভাবে দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগ প্রথমে ছিল প্রশাসনিক, কিন্তু ক্রমান্বয়ে এর রাজনৈতিক উদ্দেশেই প্রাধান্য লাভ করে। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গের পক্ষে থাকলেও পশ্চিম বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার পদ্ধতি তৈরি করে। এ আন্দোলনকারীরা প্রথমবারের মতো সারা বাংলায় একটি আন্দোলন গড়ে তোলার পদ্ধতি তৈরি করে। এ আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হয়। অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেতন হয়। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত দেখা দেয়। সাময়িকভাবে এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা চললেও সংঘাতই শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। বহু চেষ্টা করেও তাই ১৯৪৭ সালে যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সফল হয়নি। নিরুদ কুমার চৌধুরী এ সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন, "The partition of Bengal left a permanent legacy of estrangement between the Hindu and the Muslims and that a cold dislike for the Muslim settled down in our hearts, putting an end to all real intimacy of friendship. This manifested itself in the streets, the schools, and the market palce but above all, it found and abiding palce in the minds of me."

পরিশেষে বলতে পারি, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের মাধ্যমে লর্ড কার্জন ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু কার্জনের এই দূরভিসন্ধি মোটেই ফলপ্রসু হয়নি। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সমগ্র বাংলায় আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠে এবং এর শেষ পরিণাম ঘটে বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে হিন্দুরা সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ঘোষণা তাদের জন্য ছিল বিরাট আঘাত স্বরূপ। বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার মুসলমানদের জীবনধারায় যে উন্নতির সূচনা হয়েছিল তা বঙ্গভঙ্গের রদের ফলে আবার রুদ্ধ হয়।

Student Work পলাশী যুদ্ধের পটভূমি

পলাশীর যুদ্ধ কোনো আকস্মিক কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ১৮ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা, সর্ব ভারতীয় ও ইউরোপীয় ঘটনা প্রবাহের এক অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পলাশীর যুদ্ধ। বিশেষত চল্লিশের দশকে ইংরেজ ও ফরাসি বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং কোলকাতা নগরীর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ইংরেজ কোম্পানি ও নবাব সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক যে নতুন মোড় নেয় তা-ই অব্যহত পলাশী যুদ্ধের পটভূমি রচনা করে। কাজেই পলাশীর যুদ্ধ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটা পরিবর্তনের অধ্যায় যা বাঙালির কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ শোষণ ও পরাধীনতার শৃঙ্খল।

পলাশী যুদ্ধের পটভূমি :

১. **বাংলায় ইংরেজ আগমন এবং বাণিজ্য স্থাপন :** ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশ যখন আত্মরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ তখন বিশ্বের সর্বত্র বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গঠনে অবতীর্ণ। এ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ১৬০০ সালে ব্রিটেনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠনে সহায়তা করে। ১৬৫১ সালে এ ইংরেজ কোম্পানি কোলকাতা হয়ে বাংলায় আগমন করে সুবাদার শাহ সুজাকে মাত্র ৩ হাজার টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে বাংলায় অবাধে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। যদিও সুবাদার শায়েস্তা খান ইংরেজদের এই বিশেষ সুবিধা রহিত করে তাদেরকে বাংলা হতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু ১৬৯৮ সালে কোম্পানি পুনরায় আজিমুশশানের কাছ থেকে কোলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম ক্রয় করে বিনা শুল্কে বাংলায় বানিজ্য করার অধিকার পায়। পরবর্তীতে মুর্শিদকুলী খানের সময়ে তারা সম্রাট ফররুখ শিয়ারের কাছ থেকে অবাধ বাণিজ্যের ফরমান লাভ করে এবং বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশ ঘটায়। এর ফলে ধীরে ধীরে তারা বাংলায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি শক্তিরুপে আবির্ভূত হয়।

Scanned by CamScanner

২. **বাংলার অভ্যন্তরীণ ঘটনা প্রবাহ :** বাংলার আর্থ-সামাজিক ঘটনা প্রবাহ তথা মুর্শিদাবাদ দরবারের রাজনীতি পলাশী যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল। সুবাদারি যুগে বাংলা প্রশাসনের প্রধান প্রধান পদগুলোর কর্মকর্তা সরাসরি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতো, কিন্তু নবাবী আমলে এ ধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খানের নেতৃত্বে বাংলার নবাব সরকার প্রতিষ্ঠা করলে নবাবকেন্দ্রিক বঙ্গীয় প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং প্রশাসনযন্ত্রে ও জমিদার শ্রেণীতে অভিজাত হিন্দুশ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বঙ্গীয় ভৌমিক বর্গ, আমলা ও বণিক, মহাজন, অভিজাতদের নিয়ে দ্রুত বিকাশমান একটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং তাঁরা বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এদেরই ভূমিকায় এ সময় বাংলার মসনদ কেন্দ্রিক দলীয় রাজনীতি ও প্রাসাদ চক্রান্তের উদ্ভব হয়। ফলে মুর্শিদকুলী খানের পর এ চক্রের সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যতীত কোনো নবাবই ক্ষমতায় বসতে পারেনি। তাই দেখা যায় ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো এরাও ক্ষমতা লাভের জন্য আঁতাতের মাধ্যমে প্রথমে সরফরাজ খানকে উৎখাত করে সুজাউদ্দিনকে মসনদে বসায় ও পরে আলীবর্দী খানকেও অনুরুপভাবে ক্ষমতা অর্পণ করে রাজনির্মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আর এই নতুন সামাজিক শ্রেণীর পূর্ণসমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছিল ইংরেজ কোম্পানি। তাই গোলাম হোসেন সলীম বলেন, "বাংলার মসনদ দখলের জন্য এ দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীরাই ইংরেজদের সাহায্য চেয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল।"

৩. **কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ :** এভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে ইংরেজরা এ দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনেও উদ্যোগী হয়। এ সময় বাংলার মসনদ নিয়ে মীরজাফর, ঘসেটি বেগম, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, জগৎশেঠ প্রমুখ কুচক্রী মহল প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যদুনাথ সরকারের মতে, তারা সরকারের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটানোর প্রচেষ্টা চালায়। ফলে ইংরেজরা দেশের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে কূটনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নেয়। ফলশ্রুতিতে তারা সরকারের বিরুদ্ধে উক্ত সামাজিক শ্রেণী ও অনেক পদস্থ কর্মচারীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করে। এভাবেই ধীরে ধীরে পলাশী যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে।

৪. **নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজ কোম্পানির সংঘাত :** যুবরাজ অবস্থায়ই ইংরেজদের সাথে সিরাজের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তদুপরি সিংহাসনে আরোহণের পর নবাবকে কোম্পানি কর্তৃক অভিনন্দন ও উপহার না পাঠানো, নবাব আলীবর্দী খানের সময় সিরাজকে কাসিম বাজারে প্রবেশ করতে না দেয়া, নবাবের অপরাধী প্রজাদের কলকাতায় আশ্রয় দান, নবাবের অনুমতি ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে অস্ত্রে সজ্জিতকরণ, ১৭৫৬ সালে কলকাতা আক্রমণ ইত্যাদি কারণে তাঁর সাথে ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই অবস্থায় সিরাজ কোম্পানি কর্মচারীদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার বাতিল করলে কোম্পানি সিরাজকে উৎখাত করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। সিরাজের উত্তরাধিকার নিয়ে নবাব পরিবারের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করলে ইংরেজরা সে সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে কোম্পানি সিরাজকে হটিয়ে মীর জাফরকে নবাব বানানোর আশ্বাসে তার সাথে এক ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি করে। চুক্তি অনুসারে মীর জাফর ১৭৫৭ সালের ৫ জুন তারিখে শপথ নেন এবং ১৩ জুন ক্লাইভ নবাবকে চরমপত্র প্রদান করে ইংরেজ বাহিনীকে মুর্শিদাবাদ মার্চ করার নির্দেশ দেন। এর মাত্র দশ দিন পর ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে প্রহসনমূলক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধে নবাব পরাজিত হলে মীর জাফর বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের কারণ :

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মূলত, ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য এটি ছিল প্রথম সংগ্রাম। ভারতে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একশত বছরের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম ছিল একটি মহাবিদ্রোহ। প্রথমে এটি ছিল সিপাহীদের বিদ্রোহ, কিন্তু পরবর্তীতে জনগণের সমর্থনে সিপাহীদের এ বিদ্রোহ মহাবিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটানো ছিল এই মহাবিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য। আর এ সংগ্রাম ছিল বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসন্তোষের এক জ্বলন্ত প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর পি.ই. রবার্টস বলেন, "The Mutiny was mainly military in origin but it occurred at a time when for various reasons there was social and political discontentment in the country and the mutineers took advantage of the same."

মহাবিদ্রোহের কারণ : রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামরিক কারণে ১৮৫৭ সালে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এ মহাবিদ্রোহের সূচনা করে। নিচে কারণগুলো আলোচনা করা হলো-

১. **রাজনৈতিক কারণ :** কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদ নীতি এ সংগ্রামের প্রধান রাজনৈতিক কারণ। এ নীতি উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও ব্যাপক আশঙ্কার সৃষ্টি করে। লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব বিলোপ নীতির ফলে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এসব রাজ্যের রাজপরিবার, তাঁদের কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ইংরেজবিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁর প্রজাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। কানপুরের নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে দেয়া হয়। একে একে মুসলিম ও হিন্দু রাজ্যের বিলোপ, উপাধিলোপ, বৃত্তিলোপ, ভারতীয়দের উচ্চ রাজপদ থেকে বিতাড়ণ, সম্রাট বাহাদুর শাহকে পৈতৃক রাজপ্রাসাদ থেকে অপসারণ ইত্যাদি কার্যকলাপ এ দেশবাসীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। দেশীয় রাজা, সিপাহী ও জনসাধারণ সকলেই ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তির সুযোগ খোঁজে। ঝাঁসির রানী ও নানা সাহেব এ সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

Scanned by CamScanner

২. **অর্থনৈতিক কারণ :** ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে উপমহাদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস হয় এবং অনেক শ্রমিক বেকার হয়। লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বহু জমিদার জমির মালিকানা লাভ করলেও সূর্যাস্ত আইন তাদের সর্বনাশ করে। বহু লাখেরাজ সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। অনেক কৃষক ও বণিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোম্পানির কর্মচারীদের সীমাহীন দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষও অসন্তুষ্ট হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ এ অবস্থার প্রতিকারের প্রত্যাশায় মহাবিদ্রোহে যোগ দেয়। দেশীয় সিপাহী ও ইংরেজ সিপাহীদের দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষও অসন্তুষ্ট হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ এ অবস্থার প্রতিকারের প্রত্যাশায় মহাবিদ্রোহে যোগ দেয়। দেশীয় সিপাহী ও ইংরেজ সিপাহীদের মধ্যে বেতনের বৈষম্যের জন্যও দেশীয় সিপাহীরা ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

৩. **সামাজিক কারণ :** সমাজ সংস্কার ও ব্রিটিশ সরকারের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারাদি বিলুপ্ত হয়। সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ আইন পাস, বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকরণ, শিশু হত্যা নিবারণ ইত্যাদি সংস্কার সনাতন হিন্দুদের মনে তীব্র আঘাত দিয়েছিল এবং কোম্পানির শাসনের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্মেছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ প্রবর্তন প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারমূলক কার্যাবলী ভারতীয়দের সন্দেহের উদ্রেক করে। দেশীয় সৈন্যের নিম্ন বেতন তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিল। ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা রাজভাষা হিসেবে প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদেরকে সামাজিকভাবে হেয় করা হয়। এসব পরিস্থিতি ভারতীয়দের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং মহাবিদ্রোহের মূলে ইন্ধন যোগায়।

৪. **ধর্মীয় কারণ :** ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রকাশ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে। ফলে হিন্দু মুসলমানদের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাদের শঙ্কা ছিল যে, ইংরেজ সরকার উপমহাদেশের সকল ধর্মের লোককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করবে। মসজিদ-মন্দিরের খাস জমির ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে হিন্দু মুসলমানদের মনে ইংরেজ সরকার ভীষণ আঘাত হানে। ড. অতুলচন্দ্র রায় বলেন, 'মন্দির ও মসজিদের খাস জমির ওপর খাজনা ধার্য করে এবং ধর্মীয় ও দাতব্য সংস্থাগুলোর ওপর কর ধার্য করে ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের ধ্যান-ধারণার ওপর চরম আঘাত হেনেছিল। ১৮৫০ সালে আইন পাস করে ধর্মান্তরকারীদের পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করার অধিকার প্রদান করা হয়। এ সমস্ত কারণে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্রতর হতে থাকে।

৫. **সামরিক কারণ :** দেশীয় সিপাহীরা বিভিন্ন কারণে কোম্পনি সরকারের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বেতন-ভাতা, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্য ও দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈষম্য ছিল পর্বতপ্রমাণ। ১৮৫৬ সালে লর্ড ক্যানিং নতুন আইন পাস করেন যে, দেশীয় সিপাহীদের প্রয়োজনে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূর দেশে যেতে হবে। সিপাহীরা এ আইনকে তাদের ধর্মের ওপর আঘাত বলে গণ্য করে। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইংরেজ সৈন্য সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয় দেশীয় সিপাহীদের অনুপ্রাণিত করেছিল এবং ইংরেজদের অতি সহজেই এ দেশ থেকে বিতারিত করতে সক্ষম হবে- এ আত্মবিশ্বাস দেশীয় সিপাহীদের মনে বদ্ধমূল হয়।

৬. **প্রত্যক্ষ কারণ :** ১৮৫৬ সালে 'এনফিল্ড' নামে এক প্রকার বন্দুকের ব্যবহার চালু করা হয়। এ বন্দুকের কার্তুজ দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ব্যবহার করতে হতো। গুজব রটে যে, এ কার্তুজ শূকর এ গরুর চর্বি দিয়ে তৈরি। হিন্দু মুসলমান সিপাহীদের মনে বদ্ধমুল হয়েছিল যে, তাদের ধর্ম বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য ইংরেজ সরকার এ কার্তুজ প্রচলন করে। এ কারণে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় এবং দেশব্যাপী স্বাধীনতার সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে।

সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার কারণ :

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্রিটিশ সরকারের প্রতি প্রচন্ড হুমকি ও চ্যালেঞ্জস্বরুপ হলেও নিম্নলিখিত কারণে তা ব্যর্থ হয়।

১. **একতার অভাব :** বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়ের অভাবে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি ও সমঝোতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, যদিও জনগণ নিঃস্বার্থ ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল।

২. **সুপরিকল্পিত কর্মপন্থার অভাব :** কেন্দ্রীয়ভাবে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি, বরং বিপ্লবীগণ স্বীয় উদ্যমে উক্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ইংরেজ শক্তিকে এ দেশ থেকে বিতারিড় করার সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়নি বলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৩. **আদর্শ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব :** সম্রাট বাহাদুর শাহ, ঝাঁসির রানী, মারাঠা নেতা নানা সাহেব প্রত্যেকে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব এলাকায় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে লিপ্ত ছিলেন। নেতৃবৃন্দের আদর্শগত পার্থক্য ও সঠিক পথ নির্দেশনার অভাবে এ দেশীয় সিপাহীগণ দ্বিধগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এ প্রসঙ্গে ড. সেন এবং ড. মজুমদার বলেন, 'এ বিদ্রোহ পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে এটি সংঘটিত হয়নি।'

৪. **আঞ্চলিক রুপ :** এ বিপ্লব সর্বভারতীয় রুপ গ্রহণ না করে আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতনা কিংবা সিন্ধিরা, ভূপালের বেগম, নেপালের বাহাদুর জং, যোধপুরের রাজা প্রমুখ দেশীয় রাজন্যবর্গ এ বিপ্লবে যোগদান থেকে বিরত থেকে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করায় এটি ব্যর্থ হয়।

Scanned by CamScanner

৫. **যোগ্য নেতৃত্বের অভাব :** ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর অভাবের ফলে এবং হিন্দু-মুসলিম বিভেদের ফলে এটি ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি। ঐতিহাসিক হোমস বলেন, While the mutineers lacked ahead, many were half-hearted and fought reluctantly against the leaders whom they had been accustomed to obey.'

৬. **সুদক্ষ সেনানায়কের অভাব :** ভারতীয় সেনানায়কদের তুলনায় ইংরেজ সেনানায়কগণ ছিলেন অধিকতর সমরকুশলী ও সুদক্ষ। লরেন্স, নিকলসন, আউট্রাম এডওয়ার্ড প্রমুখ সুদক্ষ সেনানায়কের মতো বিপ্লবীদের মধ্যে একজনও ছিলেন না বললে অত্যুক্তি হবে না।

৭. **অনুন্নত সমরাস্ত্র :** অনুন্নত ও পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র ছিল এ দেশীয় সিপাহীদের সম্বল। ফলে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করতে সিপাহীগণ সক্ষম হননি।

৮. **জনসমর্থনের অভাব :** বিপ্লবের উদ্দেশ্যে কিংবা গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে এ দেশের জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তদুপরি বিভিন্ন রাজ্যের দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক জনগণ অত্যাচারিত হচ্ছিল। ফলে বিদ্রোহ, অনাচার ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে জনগণ এ বিপ্লবকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি।

৯. **ক্যানিং- এর শান্তি নীতি :** লর্ড ক্যানিং ভারতীয়দের প্রতি হিংসাত্মক নীতি পরিহার করে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করলে স্বভাবতই জনগণ বিপ্লবীদের বিদ্রোহ উপেক্ষা করে ইংরেজ শক্তিকে আন্তরিক সমর্থন দান করে। ফলে এ বিপ্লব সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও এটি ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। সুদীর্ঘ একশত বছরের ইংরেজ শাসনের শোষণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং কঠোরতার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগন যে দুর্জয় সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তাই পরবর্তী বংশধরকে ভবিষ্যৎ মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। তাই এ সংগ্রামকে যথার্থভাবে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন হিসেবে অখ্যায়িত করা যায়।

Student Work : ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন ঃ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ আগষ্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বিতর্কিত দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তারপর এ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রভাষা' কি হবে এ নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার চেষ্টা করছিল, অন্যদিকে পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ তাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকচক্র বাংলার আপামর জনসাধারণের বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার ঘোষণা প্রদান করে। এর প্রেক্ষিতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলার আপামর জনসাধারণ তাদের প্রাণপ্রিয় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রাজধানীর পিচঢালা রাজপথ রাঙিয়ে তুলে। বাংলার ইতিহাসে এ আন্দোলনকে ভাষা আন্দোলন বলা হয়।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

১) **ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ঃ** ডিসেম্বর, ১৯৪৭-এ করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ববাংলায় এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় এবং কতিপয় দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়। এ পরিষদের দাবি ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক) বাংলা ভাষা হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন এবং অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যম।

খ) পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি– বাংলা ও উর্দু।

২) **ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় ঃ** ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য, বিশেষত কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই দাবির বিরোধিতা করেন। ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্যে দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বাংলা ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং কার্জন হলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে ঘোষণা দিলে আন্দোলন পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়।

Scanned by CamScanner

৩) **ভাষা আন্দোলনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায় ঃ**

ক) **নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা ঃ** ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ফলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

খ) **রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ঃ** উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি এক জনসভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়।এবং ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গ) **ঐতিহাসিক মিছিল ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ঃ** ২১ ফেব্রুয়ারির উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য তৎকালীন গভর্নর নূরুল আমিন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ এব নিষেধাজ্ঞা অমান্য বের করলে পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার এক মারাত্মক সংঘর্ষ বাঁধে। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে প্রাণ হারান এবং আহত হন বহুসংখ্যক ব্যক্তি। এর ফলে সারা বাংলায় আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় এ ঘটনার প্রতিবাদে তিন দিন লাগাতার হরতাল পালিত হয় এবং দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

ঘ) **রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ ঃ** অবশেষে তীব্র বিক্ষোভের মুখে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সাময়িকভাবে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দিলে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব / ভাষা আন্দোলন ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধ/ ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের যোগসূত্র ঃ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেল। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১) **জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি ঃ** মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি পূর্ব বাংলার মানুষের সেই ভাষাকে পঙ্গু করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এ ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে গিয়ে বাংলার আপামর জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়, যার ভিত্তিতে তারা ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাজেই বলা যায়-বাঙালি জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে এই ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

২) **দাবি আদায়ের শিক্ষা ঃ** ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের ন্যায্য দাবি আদায়ের শিক্ষা দেয়। এজন্যই বাংলার আপামর জনগণ তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করে তোলে।

৩) **সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত ঃ** ভাষা আন্দোলন জনগণের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত করে। ফলে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী, প্রভৃতি সকল পেশার লোকদের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়। এরূপ চেতনাবোধ পরবর্তী আন্দোলন গুলোকে সফল করেছে। যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

৪) **সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঃ** ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মধ্য থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের মধ্যে একটি প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে। আর এ কারণেই ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান কাঁধে-কাঁধে মিলিয়ে যুদ্ধ করে স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ পূর্ব বাংলার মানুষকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিল।

৫) **মুসলিম লীগের পরাজয় ঃ** ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের প্রতি বাঙালিদের একটি সার্বিক সমর্থন ছিল। তাই এ সমর্থনের প্রতিফলন আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাই ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে। উক্ত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিতে ২১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং প্রথম দফা ছিল রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি। এর ফলে যুক্তফ্রন্টের বিজয় হয় এবং মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে।

৬) **ছাত্র রাজনীতির প্রসার ঃ** ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন ছাত্র রাজনীতির প্রসার ঘটায়। এ আন্দোলন ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়, যে কোন দাবি আদায় করতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ শিক্ষার কারণেই ১৯৭১ স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করে।

৭) **'৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ ঃ** '৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী যুক্তফেস্টোর ২১-দফার প্রথম দফাই ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের ২২৩ টি আসন লাভ করে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এপ্রিল ১৯৫৪ সালে আইন পরিষদের অধিবেশনের মুসলিম লীগ পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত পোষণ করে। এটি বাঙালি জাতির ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন।

Scanned by CamScanner

৮) **'৫৬ সালের সংবিধানে স্বীকৃতি ঃ** মার্চ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রথম আইন পরিষদে গৃহীত ভাষা ফর্মুলা এ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা ছিল বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়। সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজিকে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য সরকারি ভাষা হিসেবে চালু রাখার কথা উল্লেখ করা হয়।

৯) **রাজনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ঃ**

ক) ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে।

খ) ভাষা আন্দোলনই সর্বপ্রথম রক্তের বিনিময়ে জাতীয়বাদী গণদাবি আদায়ের শিক্ষা ও প্রেরণা দান করে।

গ) ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের ঐক্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীন গঠন এবং অধিকার আদায়ে ইস্পাত কঠিন শপথে বলীয়ান করে তোলে।

ঘ) এ আন্দোলন বাঙালি 'এলিট' এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধনে সহায়তা করে।

ঙ) ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে এই ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙা ইতিহাস।

১০) **'৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন ঃ** ৫২-এর একুশের চেতনায় ভাস্বর বাঙালি জাতি রাজনৈতিক অধিকার বা স্বাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাধিকার অর্জনের দিকে এগুতে থাকে। ৬২-র 'হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট'-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনে ছাত্র সমাজ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ শিক্ষা দিবস ঘোষণা করে। ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালি জাতিকে এমন একটি ধারণা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যে, পাকিস্তানিরা আমাদের শুধু নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করবে। তাই অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোর শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি ছয় দফাকে জাতীয় মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে।

১১) **'৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও '৭০ সালের নির্বাচন ঃ** '৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পেছনে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছি ৫২-র ভাষা আন্দোলন। ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮২টি আসন লাভ করে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল আইনসঙ্গত। কিন্তু তা না করে শুরু হয়ে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। প্রহসনমূলক আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে না, প্রয়োজনে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। সাংবাদিক এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এটাকে 'বিশ শতকের সর্বাধিক জঘন্যতম প্রবঞ্চনা' বলে আখ্যায়িত করেন। আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে ২৫ মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাত থেকে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালি নিধন অভিযান শুরু হয়ে যায়। ফলে সকল ধরনের অহিংস তৎপরতার সুযোগ নস্যাৎ হয়ে যায়।

১২) **'৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ঃ** উক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। এটি ছিল মহান ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতির কাছে প্রত্যাশার চূড়ান্ত প্রাপ্তি। সে কারণে জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। আর এতে প্রেরণা যুগিয়েছে একুশের চেতনা। সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ হানাদার বর্বর পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে বাংলার বীর জনতা।

ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এ দেশের আপামর ছাত্র সমাজের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে যে মাতৃভাষা বাংলা অর্জিত হয়েছে তার গণ্ডি এখন শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং একুশে ফেব্রুয়ারি এবং ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ভাষার জন্য বাঙালি জাতির এ আত্মত্যাগ আজ নতুন করে বিশ্বকে ভাবতে শিখিয়েছে, মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে। ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) সাধারণ পরিষদে আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ আজ বাঙালিদের মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষা আজ যে বৈশ্বিক মর্যাদা লাভ করেছে তা মূলত আমাদের জাতীয় চেতনাবোধের বিজয়। ইউনেস্কোর গৃহীত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, "সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মাতৃভাষার প্রচলন কেবল ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং বহু ভাষাভিত্তিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, তা ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।" বাংলাদেশেসহ বিশ্বের মোট ১৯৩টি দেশ বর্তমানে একুশে ফেব্রুয়ারিকে পালন করছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির জন্য এ প্রাপ্তি সহস্র মর্যাদার প্রতীক।

Scanned by CamScanner

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি এবং এর মাধ্যমে আমাদের ভাষা আন্দোলনের চেতনার সাথে সংযোগ ঘটেছে বিশ্বায়ন এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের। আমাদের ভাষা আন্দোলন আজ শুধু বাংলাদেশ বা বাঙালি জাতির ভাষা আন্দোলন নয়, বিশ্বের যে জাতিই মায়ের ভাষায় কথা বলার জন্য আন্দোলন করুক না কেন, সেখানে উৎসাহ যোগাবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। অমর একুশের আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি বয়ে এনেছে অসাধারণ গৌরব। '৫২-৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালি জাতি স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন করেছিল তা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বিশ্বায়নের এ নতুন শতাব্দীতে আমাদের মহান একুশে ফেব্রুয়ারি যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা। ২১ ফেব্রুয়ারি আজ উদযাপিত হচ্ছে নতুন আঙ্গিকে, নতুন মাত্রায়, আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে। বিশ্বের সকল দেশের কাছে বাংলাদেশ আজ ভাষাভিত্তিক জাতীয় অন্দোলনের মূর্ত প্রতীক।

পরিশেষে বলতে পারি, পূর্ব বাংলার জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে সূত্রপাত ঘটলেও মূলতঃ এটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলার জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। ফলে জনগণের মনে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্খা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। এই ও আন্দোলন পরবর্তীতে বাঙালি জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের শিক্ষা, সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এক কথায় বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম মূলমন্ত্র ছিল। সুতরাং বাঙালির জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

Student Work | ছয়দফা আন্দোলন

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত বৈষম্য ও দীর্ঘ শোষণনীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রশ্নে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সাবজেক্ট কমিটির মিটিংয়ে প্রথম ছয় দফা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটিতে ছয় দফা প্রস্তাব ও তার জন্য আন্দোলনের কর্মসূচি পেশ করেন। ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি ৬ দফাকে জাতীয় মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এটি ছিল মারণাস্ত্রস্বরূপ।

ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি ঃ যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১) **পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত শোষণ ঃ** ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় যা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দু ভাগে বিভক্ত ছিল। ভৌগোলিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অভ্যুদয় হয়। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, নির্যাতন, জাতিগত নিপীড়ন ও প্রশাসনিক বঞ্চনার সূচনা করে, যা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

২) **শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ঃ** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে তৎকালীন পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে রাজনৈতিক কর্মধারাকে জোর করে স্তব্ধ করার চেষ্টা চালায়। বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত। ফলে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়।

৩) **অর্থনৈতিক বৈষম্য ঃ** পাকিস্তানের প্রায় সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, স্টেট ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা ও বৈদেশিক মিশনসমূহ পশ্চিমাংশে থাকার কারণে অর্থের মজুদও গড়ে ওঠে সেখানে। পূর্বাঞ্চলের পাট থেকে অর্জিত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিমাংশে ব্যয় করা হতো। পূর্বাংশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের নিজস্ব ক্ষমতা নেই-এ অজুহাতে সকল বৈদেশিক মুদ্রাই পশ্চিমাংশে চলে যেত। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক বৈষম্যের গগণচুম্বী প্রাচীর।

৪) **চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ** পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালিদের প্রতি বিশেষ উদাসীন নীতি পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের চাকরির ক্ষেত্রে ১৬% এবং সামরিক বাহিনীতে ১০%-এর বেশি পূর্ব পাকিস্তানি ছিল না। স্থল, নৌ, বিমান ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির সকল সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। আইয়ুব সরকারের আমলে এ বৈষম্য ও বঞ্চনা তীব্র আকার ধারণ করে।

৫) **পূর্ববাংলায় তীব্র অসন্তোষ ঃ** ১৯৫৪-৬৫ সালের নির্বাচনে বিজয় লাভের পর আইয়ুব সরকার ও তার সহযোগী মৌলিক গণতন্ত্রী আমলা, কনভেনশন ও মুসলিম লীগের সদস্যদের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার পূর্ব বাংলার জনজীবনে যথেষ্ট মানসিক চাপ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

Scanned by CamScanner

৬) **সামরিক অসহায়ত্ব ঃ** পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ ভৌগোলিক কারণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা উচিত ছিল। কিন্তু সকল সামরিক দপ্তর, অস্ত্র দপ্তর ও অস্ত্র কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানেই স্থাপন করা হয়। আইয়ুব খানের যুক্তি ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানে নিহিত রয়েছে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ আইয়ুবের এই যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে।

৭) **১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ঃ** ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় থেকে বাঙালিরা নিজেদের অসহায়ত্ব বুঝতে পারে এবং নিজেদের নিরাপত্তা শক্তির ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এ যুদ্ধ বাঙালি জাতিকে এমন একটি ধারণা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যে, পাকিস্তানিরা শুধু নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমাদের ব্যবহার করবে। তাই অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন।

ছয় দফা কর্মসূচি ঃ ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করার সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি বলে উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক এ ছয় দফা কর্মসূচিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের এক সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। নিচে ছয় দফা কর্মসূচির বিবরণ দেয়া হলো:

১) **প্রথম দফা-শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ঃ** ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সত্যিকার ফেডারেশন ধরনের সংবিধান রচনা করতে হবে। তাতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আইসভার সার্বভৌমত্ব থাকবে।

বিশ্লেষণ ঃ লাহোর প্রস্তাব ছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রাণের দাবি। লাহোর প্রস্তাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল বিধান উল্লেখ ছিল তার ভিত্তিতে ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের মুসলমানগণ রায় দিয়েছিল। আবার ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মূলে ছিল এ লাহোর প্রস্তাব। সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার প্রথম দফায় যে প্রস্তাব করেছেন তা নতুন কোনো প্রস্তাব ছিল না, যা পাকবাহিনীর মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, সর্বজনীন ভোটাধিকার ও সার্বভৌম আইন পরিষদ-এই ছিল প্রথম দফার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

২) **দ্বিতীয় দফা-কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ঃ** দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়সমূহ থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

বিশ্লেষণ ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ক্ষমতা দিয়ে এক অর্থে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকেই তুলে ধরা হয়েছে। এই দফা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছেন, 'এই প্রস্তাবের জন্যই কায়েমি স্বার্থের দালালরা আমার ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটেছে। আমি নাকি পাকিস্তানকে দু টুকরো করার প্রস্তাব দিয়েছি।

৩) **তৃতীয় দফা-মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক ক্ষমতা ঃ**

১) পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন এবং দুটো স্টেট ব্যাংক স্থাপন করতে হবে।

২) দুই অঞ্চলে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে দুই মুদ্রা থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে পারবে না, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

বিশ্লেষণ ঃ তৃতীয় দফার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেন যে, আমার এই প্রস্তাবের মর্মার্থ হলো এই যে, উপরোক্ত দুটো বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকবে। যে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমন থাকবে। পার্থক্য শুধু এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ইস্যু করা হবে এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তান বা সংক্ষেপে ঢাকা লেখা থাকবে । তদ্রূপ পশ্চিম পাকিস্তানেও থাকবে। মূলত এ মুদ্রা ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিল।

৪) **চতুর্থ দফা-কর ও শুল্কবিষয়ক ক্ষমতা ঃ** সকল প্রকার কর ও শুল্ক ধার্য এবং তা আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত রাজস্বের নির্ধারিত অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে।

বিশ্লেষণ ঃ এই দফার সুবিধা অনেক। যেমন-

ক) কেন্দ্রীয় সরকারকে কর আদায়ের কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না।

খ) কর ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনো দপ্তর বা কর্মকর্তার প্রয়োজন হবে না।

গ) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের জন্য কর ধার্য ও আদায়ের মধ্যে কোনোরূপ দ্বৈততা থাকবে না । এতে অপচয় ও অপব্যয় রোধ হবে।

ঘ) এর ফলে কর ধার্য ও আদায়ের একত্রীকরণ সহজ হবে।

Scanned by CamScanner

৫) **পঞ্চম দফা-বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক ক্ষমতা ঃ** এ দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নলিখিত শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়:

ক) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ) রাজ্য সরকার নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিজেদের এখতিয়ারে রাখবে।

গ) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সমানভাবে বা সংবিধানে নির্ধারিত হার অনুযায়ী আদায় করা হবে।

ঘ) দেশে উৎপাদিত পণ্য বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলে আমদানি-রপ্তানি হবে।

ঙ) বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানি-রপ্তানির অধিকার রাজ্য সরকারকে দিতে হবে।

বিশ্লেষণ ঃ পঞ্চম দফার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে ছয় দফার প্রবক্তাগণ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। সে কারণে পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়ে না উঠায় পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নেই- এ অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হচ্ছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অনুন্নতই থেকে যাচ্ছে।

৬) **ষষ্ঠ দফা-আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা ঃ** পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য নিজস্ব গণবাহিনী বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দিতে হবে।

বিশ্লেষণ ঃ ষষ্ঠ দফার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবু রহমান নিজেই বলেন যে, এ দাবি অন্যায়ও নয় নতুন নয়। কারণ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ভিত্তিক দাবির মধ্যে আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করা হয়েছিল।

ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব ঃ পাকিস্তানে স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তি সনদ। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন যে, ছয় দফা বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙালির মুক্তি সনদ এবং বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ। শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয় দফা। এ আন্দোলন মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাইকে নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইতিহাসে এ ছয় দফা আন্দোলন পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নিচে ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো ঃ

প্রথমত, বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ছয় দফা আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় ছয় দফা দাবি ছিল পাকিস্তানের জাতীয় 'মুক্তির সনদ'।

দ্বিতীয়ত, ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাগ্রত বাঙালি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। ড. মুহাম্মদ হান্নান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম স্মারক, যেখানে বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রাম নতুনভাবে গতি লাভ করেছিল।'

তৃতীয়ত, ছয় দফা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সংগ্রামী শক্তি যোগায়। ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালিদের কাছে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্তির সনদ হিসেবে দেখা দেয়।

চতুর্থত, ছয় দফা আন্দোলন এর আগের আন্দোলনগুলোর তুলনায় অধিকতর গণমুখী ছিল। এতে সাধারণ মানুষও অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া এ আন্দোলন জনগণের সংগ্রামী মনোভাবকে দৃঢ়তর করে।

পঞ্চমত, ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা প্রথমবারের মতো সরাসরি সরকারি কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। সংগ্রামী জনতা পুলিশের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এভাবে ছয় দফা আন্দোলন প্রচ্ছন্নভাবে ভবিষ্যতে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হবার প্রেরণা যোগায়।

পাকিস্তানি স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির পটভূমিতে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার এক মূর্ত প্রতীক। ড. মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া বলেন, 'ছয় দফা আন্দোলনই পরবর্তীকালে একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।' তাই যথার্থই বলা হয়ে থাকে, ছয় দফার মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

Scanned by CamScanner

BCS প্রশ্নাবলী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

- ☑ যুদ্ধাপরাধ কি? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কয়টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। (৩৩তম বিসিএস)
- ☑ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনা করুন। (৩৩তম বিসিএস)
- ☑ সংক্ষেপে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করুন। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন। (২৯তম বিসিএস)
- ☑ বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহা, ক্রমবিকাশমান স্বাধীনতার চেতনা, রাজনৈতিক সংঘটন, ১৯৭৪ হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত এবং বিশেষভাবে ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর ঘটনাপ্রবাহ সমন্বিত করে কিভাবে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো তা বর্ণনা করুন। (২৯তম বিসিএস)
- ☑ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর আলোকপাত করুন। (২৮তম বিসিএস)

Student Work

যুদ্ধাপরাধ এবং বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া

ভূমিকা : যুদ্ধপরাধ মানবতাবিরোধী এক জঘন্যতম আন্তর্জাতিক অপরাধ। সাধারণত যুদ্ধের সময় গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ষড়যন্ত্র, নারী ধর্ষন প্রভৃতি অপরাধই হচ্ছে যুদ্ধপরাধ। পৃথিবীর অনেক দেশেই এই ঘৃণ্যতম অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। দেশে দেশে এই অপরাধের বিচারও হয়েছে, এমনি এক ঘৃণ্যতম অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল বাংলাদেশে, ১৯৭১ সালে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সাড়ে সাত কোটি শান্তি প্রিয় মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি সৈন্য রূপে হায়েনারা। তাদের গণহত্যা, ধর্ষন, অগ্নিসংযোগের ফলে এদেশের ত্রিশ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে, ২ লক্ষ নারী ধর্ষিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘর বাড়ী ছাড়া হয়েছে। দীর্ঘ ৩৯ বছর পর বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধিদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে এখনও তা অব্যাহত আছে।

যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞা : যুদ্ধাপরাধ বলতে কোনো দেশ, জাতি, সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তি কর্তৃক যুদ্ধের প্রথা বা আন্তর্জাতিক নীতিমালা লঙ্ঘন করাকে বোঝায়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত 'দ্য ব্যাক বুক অফ কমিউনিজম : ক্রাইম, টেরর, রিপ্রেশান' গ্রন্থে যুদ্ধাপরাধের সাংজ্ঞিক অর্থ 'যুদ্ধের আইন বা প্রথাকে লঙ্ঘন করা' বলতে হত্যা, নির্যাতন বা সাধারণ নাগরিকদের নির্বাচিত করে অধিকৃত জনপদে ক্রীতদাস শ্রম ক্যাম্পে পরিণত করা, আটককৃতদের হত্যা ও নির্যাতন, অপহৃতদের হত্যা, সামরিক বা বেসামরিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই দায়িত্বজ্ঞানহীন নগর, শহর ও গ্রামাঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করাকে উলেখ করা হয়।

Definition of United Nations Human Rights office :
"The term "war crimes" refers to serious breaches of international humanitarian law committed against civilians or enemy combatants during an international or domestic armed conflict, for which the perpetrators may be held criminally liable on an individual basis."

Defination of International Committee of Red Cross (ICRC) :
War Crime is "Acts or omissions committed during an armed conflict, which violate the rules of law as defined by international law. These acts or omissions include the ill-treatment of civilians within occupied territories, the violation and exploitation of individuals and private property, and the torture and execution of prisoners".

Defination by Marko Divac Oberg, International Review of Red Cross, 2009 :
"War crimes: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity."

Scanned by CamScanner

চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৪৭ ধারায় যুদ্ধাপরাধ প্রসঙ্গে বলা হয় : ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা, নির্যাতন বা অমানবিক ব্যবহার এবং কারো শরীর বা স্বাস্থ্যে গুরুতর আঘাত করা বা তার দুর্দশার কারণ তৈরি, অন্যায়ভাবে কাউকে বিতাড়ন বা স্থানান্তর করা বা আটক করা, সশস্ত্রবাহিনীর সেবাদানে বাধ্য করা, যথাযথ ও নিয়মতান্ত্রিক বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা, কাউকে জিম্মি করা, বিপুল পরিমাণে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, সামরিক প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বেআইনি ও নীতিবিরুদ্ধ ওপরের যে কোনো এক বা একাধিক কর্মকাণ্ড যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। যুদ্ধাপরাধের ধারণার মর্মমূলে ছিল যে, একটি দেশের বা দেশের সৈন্যদের কাজের জন্য একজন ব্যক্তিও দায়ী হতে পারেন। গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, সাধারণ নাগরিকদের হয়রানি– এসবই যুদ্ধাপরাধের মধ্যে পড়ে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হলো গণহত্যা।
সুতরাং যুদ্ধাপরাধ হচ্ছে কোনো যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত চলাকালীন সময়ে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে সংগঠিত, সমর্থিত নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত অপরাধ কর্মকাণ্ডসমূহ।

দেশে দেশে যুদ্ধাপরাধ ও বিচার : যুদ্ধাপরাধ একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ। এটি এখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আওতায় চলে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে যে কোনো অপরাধকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে নানা আঙ্গিকে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আবার যুদ্ধাপরাধের বিচারে গঠিত হয়েছে বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল ও কোর্ট। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের ধারণা :** ১৮৯৯ সালে ফিলিপাইন-আমেরিকান যুদ্ধকালীন সময়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্দেশ্যে হল্যান্ডে আয়োজিত Hague Peace Conference-1 এ প্রথমবারের মতো Laws of war এবং War crime-গুলোকে চিহ্নিত করে তা আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এখানে প্রথমবারের মতো হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এখানে প্রথমবারের মতো যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কনসেপ্টের সূচনা হয়েছিল।

২. **উলেখযোগ্য ট্রাইব্যুনাল :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধ নিয়ে বিশ্বের ছোট বড় দেশগুলো সোচ্চার হওয়ায় বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এর মধ্যে উলেখযোগ্য হলো– ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল, টোকিও ট্রাইব্যুনাল, যুগোস্লাভিয়া ট্রাইব্যুনাল ও রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল। এগুলো ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

দেশে দেশে যুদ্ধাপরাধ ও বিচার

ট্রাইব্যুনাল	প্রতিষ্ঠা	কার্যক্রম শুরু-শেষ	রায় প্রকাশ	অভিযুক্ত	শাস্তি
ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল	৭ জুলাই ১৯৪৫	১৮ অক্টোবর ১৯৪৫- ৩১ আগস্ট ১৯৪৬	১ অক্টোবর ১৯৪৬ –	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির অভিযুক্ত ২৪ সেনা	মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত-১২ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড-৩ জন এবং কারাদণ্ড-৪৫ জন
টোকিও ট্রাইব্যুনাল	২০ জুলাই ১৯৪৫	১৯৪৬ সালের জুন মাসে	নভেম্বর ১৯৪৮	জাপানের ২৮ জন যুদ্ধাপরাধী	বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়।
যুগোস্লাভিয়া ট্রাইব্যুনাল	২৫ মে ১৯৯৩-এ গঠিত এবং ১৭ নভেম্বর ১৯৯৩ প্রতিষ্ঠিত	৮ নভেম্বর ১৯৯৪- চলমান	Verdicts will complete in 2015	বসনিয়ার সার্ব নেতা ও সামরিক কমান্ডারগণ	Verdicts will complete in 2015
রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল	৮ নভেম্বর ১৯৯৪	১৯৯৭	১৯৯৮	রুয়ান্ডা গণহত্যার জড়িত তুতসিরা	রুয়ান্ডার সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান।

৩. **আইসিসি গঠন :** বিভিন্ন দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২০০২ সালে নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে গঠন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি)। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইসরাইলসহ বেশ কয়েকটি দেশ এ আন্তর্জাতিক আদালতের বিরোধীতা করে এবং এর সাথে যে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা রাখতে অস্বীকার করে।

৪. **বিশেষ আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোর্ট :** যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনের সমন্বয়ে বিশেষ আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোর্ট স্থাপিত হয়। যেমন– সিয়েরা লিওনের বিশেষ আদালত, লেবাননের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, পূর্ব তিমুরে দিলি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, কম্বোডিয়া ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা : বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের প্রকৃতি খুবই ভয়াবহ ও লোমহর্ষক। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সশস্ত্র হায়েনা বাহিনী তাদের এদেশীয় কুচক্রী মহল নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে হত্যা, লুট, ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড ও বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলা চালায়। এরা নির্বিচারে গণহত্যা, গণধর্ষণ, লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগে অংশ নেয়। ভয়াল দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লাখ মুক্তিকামী বাঙালি শাহাদতবরণ করে, সম্ভ্রম হারায় ২ লাখ মা-বোন। তাই স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা রয়েছে। এছাড়াও নিম্নোক্ত কারনেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি−

১. **আইনভঙ্গ, সনদ ও চুক্তিপত্র অমান্য :** মুক্তিযুদ্ধকালে বর্বর পাকিস্তানিরা আইনভঙ্গ, সনদ ও চুক্তিপত্র অমান্যের সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে। এ সময় ইয়াহিয়া খান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বিমান ও নৌবাহিনী ব্যবহারের সংশিষ্ট সকল আইন ভঙ্গ, জাতিসংঘের সনদ পদদলিত, ১৯৪৮ সালের গণহত্যা চুক্তিসভাপত্র অমান্য, ১৯৪৯ সালের চারটি চুক্তিসভাপত্রও অগ্রাহ্য, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক নয় এমন এক সশস্ত্র সংঘর্ষকালে যে সকল নিয়ম মানতে প্রতিটি রাষ্ট্র বাধ্য তা অমান্য, নিরাপরাধ লোকের অধিকার হরণ, সংঘর্ষকালে ত্রাণকার্য সম্পর্কিত আইনকানুন অগ্রাহ্য এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইনও তারা ভঙ্গ করেছে।

২. **হত্যা ও সম্পত্তি বিনষ্ট :** পাকিস্তানিরা জাতিগত, জাতীয়তাগত, ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, গোত্রগত, ভেদনীতি গ্রহণ করে অসামরিক নর-নারীকে হত্যা, অসামরিক জনসাধারণের সম্পত্তি বিনষ্ট এবং একটি জাতির সকল অস্তিত্ব ধ্বংসের হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আর তাদের এ প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে এদেশীয় ঘৃণ্য দোসররা।

৩. **বিদেশী পত্রিকার প্রতিবেদন ও প্রতিবেদকের মন্তব্যে ধ্বংসযজ্ঞ :** ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ প্রকৃতি শুধুমাত্র দেশীয় পত্রিকার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের নাম করা পত্রিকাগুলোর সচিত্র প্রতিবেদন ও প্রতিবেদকের মন্তব্যে চিত্র ফুটে উঠেছে। নিচে এমন কয়েকটি পত্রিকার প্রতিবেদন ও প্রতিবেদকের মন্তব্য উলেখ করা হলো−

ক. **টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া :** আমেরিকান এইড (AID) কার্যসূচির অধীনে ৩ বছর ঢাকায় ছিলেন জন রোড নামক জনৈক আমেরিকান কর্মকর্তা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির সামনে যে জবানবন্দী দেন (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২ মে ১৯৭১) তাতে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবী হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। তিনি ২৯ মার্চ ১৯৭১ রমনা কালীবাড়ি পরিদর্শন করে দেখেন যে, সেখানে ২০০ থেকে ৩০০ লোক হত্যা করা হয়েছে। মেশিনগানের গুলি খেয়ে, আগুনে পুড়ে নর-নারী ও শিশুদের মৃতদেহ পড়ে আছে। সকল জায়গা ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়।

খ. **নিউইয়র্ক টাইমস্ :** নিউইয়র্কের টাইমস্ ৩০ মার্চ ১৯৭১ সালে প্রদত্ত রিপোর্ট উলেখ করে, সর্বত্র বেসামরিক ব্যক্তিদের সেনাবাহিনী হত্যা করেছে।

গ. **টাইম :** ৩ মে ১৯৭১ নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকায় উলেখ করা হয়, একজন যুবক সৈন্যদের কাছে আকুল প্রার্থনা জানায় তাকে যা কিছু করা হোক না কেন, তার ১৭ বছরের বোনটিকে যেন রেহাই দেয়া হয়। তার সামনেই বেয়নেট দিয়ে বোনটিকে হত্যা করে পশুরা।

ঘ. **ল্য এক্সপ্রেস পত্রিকার প্রতিবেদকের মন্তব্য :** ফ্রান্সের 'ল্য এক্সপ্রেস' পত্রিকার সাংবাদিক তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা দেন এভাবে, 'প্রতি রাতেই আমি মেশিনগান ও মর্টারের গুলির শব্দ শুনতাম। বাঙালিদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে ধরতো সৈন্যরা, তারপর যানবাহনের পেছনে এমনভাবে বেঁধে দিতে যাতে তাদের মাথা মাটিতে বারবার এসে আঘাত হানে।

ঙ. **সানডে টাইমস :** সানডে টাইমস পত্রিকায় পাকিস্তানস্থ প্রতিনিধি (১৩ জুন ১৯৭১ সংখ্যা) উল্লেখ করেন যে, সে সময় যে শত শত মুসলমানদের পাকড়াও করা হয়েছিল তাদেরও কোনা চিহ্ন পরবর্তীতে আর মেলেনি।' ১৫ এপ্রিল ১৯৭১ তিনি ঢাকায় ঘেরার সময় দেখেছেন যে, 'ইকবাল হলের (বর্তমান জহুরুল হক হল) দুটি সিঁড়িতে প্রচুর রক্ত তখনও ছড়িয়ে আছে এবং হলের ছাদে চারজন ছাত্রের মাথা তখনও পচছে। দেয়ালে গুলির দাগ এবং রীতিমত ডিডিটি পাউডার ছড়িয়ে দেয়া সত্ত্বেও চারদিকে দুর্গন্ধ। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ২৩ জন মহিলা ও শিশুর পচা লাশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

চ. **সানডে টেলিগ্রাফ :** লন্ডনের সানডে টেলিগ্রাফ পত্রিকা ৪ এপ্রিল ১৯৭১ পাকিস্তানি কুচক্রীদের মানসিকতা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও মন্তব্য লেখে, 'গত সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নৃশংসভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকারকামী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করা ছাড়া আর সবই করেছে। পাকিস্তানের জেনারেল ও কর্নেলরা খুব সাবধানে দু'বছর ধরে যে পরিকল্পনা করেছে তারই ফল এই নৃশংসতা। তাদের অনেকেই ব্রিটিশদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, অনেকেই চারিত্রিক নম্রতায় না হলেও বাহ্যিক ব্যবহারে 'ব্রিটিশদের চাইতেও ব্রিটিশ'।

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের যুদ্ধপরাধ : ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বাংলাদেশে ১৭ ধরনের যুদ্ধাপরাধ, ১৩ ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং ৪ ধরনের গণহত্যাজনিত অপরাধসহ মোট ৫৩ ধরনের অপরাধে লিপ্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে শীর্ষ পাঁচ যুদ্ধাপরাধ হলো–

(i) ১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চ ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে সেনা অভিযানে নির্বিচারে ৫০ হাজার বাঙালি নিধন। যুদ্ধকালীন সর্বমোট ৩০ লাখ বাঙালিকে নৃশংসভাবে হত্যা।

(ii) লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও দেশজুড়ে হত্যাকাণ্ড।

(iii) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুর্বপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আমলা, ছাত্র ও সমাজকর্মীদের হত্যা এবং তাদের গণকবর দেয়া।

(iv) হাজার হাজার বাঙালি নারীকে ধর্ষণ ও নিগ্রহ।

(v) এদেশ থেকে হিন্দু জাতিসত্তাকে নির্মূলের জন্য হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন।

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত সংগঠন :

১. **শান্তি কমিটি :** ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে চলাকালে পাকিস্তান প্রশাসনকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল তারিখে ঢাকায় শান্তি কমিটি গঠিত হয়। শান্তি কমিটি উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করা এবং দেশকে বিচ্ছিন্ন করার হাত থেকে রক্ষা করে পাকিস্তানি হুকুমত বজায় রাখা। ক্রমান্বয়ে সারাদেশে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা এসব কমিটি গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করে।

২. **রাজাকার বাহিনী :** ১৯৭১ সালের মে মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক সরকার তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে 'রাজাকার' নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। এই বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান সহযোগী হিসেবে এই বাহিনী দায়িত্ব পালন করে। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে এই বাহিনীর অত্যাচারের চিহ্ন আজো বিদ্যমান।

৩. **আল-বদর বাহিনী :** ১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসে ময়মনসিংহে এই বাহিনী গঠিত হয়। সম্পূর্ণ ধর্মীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে এই বাহিনীর গঠন ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। আল-বদর বাহিনীর কার্যকলাপের মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড অন্যতম। মিরপুর বধ্যভূমি এই বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সাক্ষ্য বহন করে।

৪. **আল-শাম্‌স বাহিনী :** ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সহযোগী স্বাধীনতা-বিরোধী এক শ্রেণির ধর্মান্ধ ও শিক্ষিত তরুণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ও ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে আল-শাম্‌স বাহিনী গঠন করে। আল বদর বাহিনীর সঙ্গে মিশে এরা দেশের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের এবং স্বাধীনতা লাভের পূর্বক্ষণে বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

বাংলদেশে যুদ্ধপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ৯৩,০০০ সৈন্য ঢাকার রমনা রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণে অন্তর্ভুক্ত ছিল পাকিস্তানের সকল আধা-সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক সশস্ত্রবাহিনীসহ স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীর সকল সদস্য। আত্মসমর্পণের দলিলে আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, আত্মসমর্পণকারী সকল ব্যক্তির সঙ্গে জেনেভা কনভেনশনের বিধান অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ করা হবে এবং তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে। নিচে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো :

১. **বিচারের ঘোষণা ও আইন পাস :** ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে দেশে আসার পর রেসকোর্স ময়দানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ঘোষণা দেন। Bangladesh (Special Tribunals) Order, 1972 নামে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রথম আইন পাস হয়।

২. **দালাল আইন প্রয়োগ :** ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা প্রবর্তিত দালাল আইনটির প্রয়োগ শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে।

৩. **সংশোধনী ও বিচার আরম্ভ :** ১৯৭২ সাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আইনটির তিন দফা সংশোধনী হয়। এ আইনের অধীনে ৩৭ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিভিন্ন আদালতে তাদের বিচার আরম্ভ হয়।

Scanned by CamScanner

৪. **সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা :** ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ ধরনের অপরাধে জড়িতদের বাইরের রেখে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই ১৮ ধরণের অপরাধ হলো– ১. বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর চেষ্টা; ২. বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর ষড়যন্ত্র; ৩. রাষ্ট্রদ্রোহিতা; ৪. হত্যা; ৫. হত্যার চেষ্টা; ৬. অপহরণ; ৭. হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ; ৮. আটক রাখার উদ্দেশ্যে অপহরণ; ৯. অপহৃত ব্যক্তিকে গুম ও আটক রাখা; ১০. ধর্ষণ; ১১. দস্যুবৃত্তি; ১২ দস্যুবৃত্তিকালে আঘাত; ১৩. ডাকাতি; ১৪. খুনসহ ডাকাতি; ১৫. হত্যা বা মারাত্মক আঘাতসহ দস্যুবৃত্তি অথবা ডাকাতি; ১৬. আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে ক্ষতিসাধন; ১৭. বাড়িঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার; ১৮. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারা (আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে কোনো [illegible] ক্ষতিসাধন) অথবা এসব কাজে উৎসাহ দান।

৫. **সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রভাব :** বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকালীন কারাগারে ৩৭ হাজার ৪১ জন বন্দি ছিল। ৭৩টি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল করে তাদের বিচার কাজ চালানো হচ্ছিল। এ সাধারণ ক্ষমার আওতায় ২৫ হাজার ৭১৯ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া পেয়ে যায়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আটক বাকি প্রায় ১১ হাজারের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার চলছিল। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ২ হাজার ৮৮৪ টি মামলার নিস্পত্তি হয়। এতে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল ১৯ জনের, বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মূলত দালাল আইনেই এ বিচারকার্য পরিচালনা করা হয়।

৬. **যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবি :** ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৯৩,০০০ আত্মসমর্পণকারী যুদ্ধবন্দিকে ভারতীয় হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। আত্মসমর্পণের পরপরই বাংলাদেশ এ পর্যায়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে বিচার জন্য শনাক্ত করে। তবে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত সিমলা চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধবন্দির বিচারের জোর দাবি জানাতে থাকে। প্রস্তাবিত বিচারের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আদালতে একটি আনুষ্ঠানিক আবেদনও পেশ করে।

৭. **চুক্তি স্বাক্ষর :** যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবির প্রেক্ষিতে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ১৯৭৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ইসলামাবাদ ও দিলি-তে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য পুনরায় বৈঠকে মিলিত হয়। দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত শেষ চুক্তি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট গুরুতর যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ১৯৫ জন ব্যতীত বাকি সকল যুদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়।

৮. **যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবি প্রত্যাহার :** ১৯৭৪ সালে লাহোর ইসলামী ঐক্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলন এবং পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পর তিনটি দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা নয়াদিল্লিতে পুনরায় বৈঠকে মিলিত হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বাংলাদেশকে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের দাবি প্রত্যাহারে রাজি করানো হয়।

৯. **নির্বাচনী ইশতেহারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার :** ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত বিষয়টি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করে এবং জনগণকে এ মর্মে নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা সরকার গঠন করতে পারলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলার এ মাটিতে নিশ্চিত করবে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়। এরপর সরকার গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে।

১০. **প্রজ্ঞাপন জারি ও সংশোধনী পাস :** মার্চ ২০১০ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্রানাল, তদন্ত সংস্থা ও আইনজীবী প্যানেল গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। ২০০৯ সালের ৯ জুলাই জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্টের সংশোধনী পাস করা হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনাল : যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

(i) **ট্রাইব্যুনাল-১ :** আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩-এর ১৯-এর ৬ নং সেকশনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০১০ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ গঠন করা হয়। তখন এর চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন বিচারপতি নিজামুল হক।

(ii) **ট্রাইব্যুনাল-২ :** বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করা হয় ২২ মার্চ ২০১২। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনাল অনুযায়ী ট্রাইন্যুনাল-২ এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হলেন- বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং সদস্য বিচারপতি মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও বিচারপতি মজিবুর রহমান মিয়া।

উল্লেখ্য, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে বিচারপতি আনোয়ারুল হক কে চেয়ারম্যান এবং বিচারপতি মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলাম ও হাই কোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি মো : সোহরাওয়ার্দী কে সদস্য করে ট্রাইব্যুনাল-১ পুণঃর্গঠন করা হয়। ট্রাইব্যুনাল-২ কে নিষ্ক্রিয় করে বিচারপতি এম এনায়েতুর রহিম, বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন ও বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া কে হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হয়।

Scanned by CamScanner

ট্রাইব্যুনালের রায় : যুদ্ধাপরাধী ট্রাইব্যুনাল প্রথম রায় প্রকাশ করেন ২১ জানুয়ারি ২০১৩। ট্রাইব্যুনাল-২ এর এ রায়ে যুদ্ধাপরাধী মাওলানা আবুল কালাম আযাদকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয়। বর্তমানে তিনি পলাতক আছেন। এরপর যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল দ্বিতীয় রায় প্রদান করেন ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩। ট্রাইব্যুনাল-২ এ রায়ে কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। আপিল শুনানির শেষে তার ফাঁসির আদেশ হয় এবং এই রায় কার্যকর করা হয় ১২ ডিসেম্বর, ২০১৩। এরপরই যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল তৃতীয় রায় প্রদান করেন ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩। ট্রাইব্যুনাল-১ এর এ রায়ে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু আপিলে তার আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ হয়। যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল চতুর্থ রায় প্রদান করে ৯ মে ২০১৩। ট্রাইন্যুনাল-২ এর এ রায়ে মুহাম্মদ কামরুজ্জামানকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয়।-আপিল শুনানির শেষে এই রায় কার্যকর করা হয় ১১ এপ্রিল ২০১৫।

যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল পঞ্চম রায় প্রদান করে ১৫ জুলাই ২০১৩। ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে গোলাম আযমের ৯০ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। দণ্ড ভোগকালে তিনি ২৩/১০/২০১৪ তে মৃত্যু বরণ করেন।

যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল ষষ্ঠ রায় প্রদান করে ১৭ জুলাই ২০১৩। ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়ে সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মুজাহিদ কে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয়। আপিলে মৃত্যু দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয় ২২/১১/২০১৫ তে।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরি কে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় যা আপিলেও বহাল থাকে। রায় কার্যকর হয় ২২/১১/২০১৫ তারিখে।

ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়ে আব্দুল আলিম কে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। দণ্ড ভোগকালে তিনি ৩০/০৮/২০১৪ তে মৃত্যু বরণ করেন।

ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়ে আশরাফুজ্জামান খান কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ০৩/১০/২০১৩। (পলাতক)

ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়ে চৌধুরী মুঈনুদ্দীন কে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ০৩/১০/২০১৩। (পলাতক)

ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে মতিউর রহমান নিজামি কে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ২৯/১০/২০১৪ তে। আপিলের রায়েও মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয় ০৬/০১/২০১৬ তে।

ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়ে মীর কাসেম আলী কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ০২/১১/২০১৪ তে। আপিলে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয় ০৮/০৩/২০১৬ তে।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে এম জাহিদ হোসেন কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ১৩/১১/২০১৪ তে। (পলাতক)

ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে কমান্ডার মোঃ মোবারক হোসেন কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ২৪/১১/২০১৪ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়ে সৈয়দ মো: কায়সার কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ২৩/১২/২০১৪ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে এটিএম আজহারুল ইসলাম কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ৩০/১২/২০১৪ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়ে মুহাম্মদ আবদুস সুবহান কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ১৮/০২/২০১৫ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে আব্দুল জব্বার কে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করা হয় ২৪/০২/২০১৫ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়ে মাহিদুর রহমান কে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করা হয় ২০/০৫/২০১৫ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়ে আফসার রহমান কে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করা হয় ২০/০৫/২০১৫ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে সৈয়দ মো: হাসান আলী কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ০৯/০৬/২০১৫ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়ে ফোরকান মল্লিক কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ১৬/০৭/২০১৫ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে সৈয়দ শেখ সিরাজুল হক ওরফে সিরাজ মাস্টার কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ১১/০৮/২০১৫ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে খান মো: আকরাম হোসেন কে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করা হয় ১১/০৮/২০১৫ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে খান ওবায়দুল হক (তাহের) কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ০২/০২/২০১৬ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর রায়ে আতাউর রহমান (ননি) কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ০২/০২/২০১৬ তে। আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে– ক্ষমতাগর্বী, অন্যায়কারী সব সময়ই আত্মধ্বংসী নীতি গ্রহণ করে পৃথিবীর নিরপরাধ মানুষের দুর্দশার কারণ হয়, পরিণামে সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যায়। হিটলারের মতো বহু অমানুষেরই শেষ পরিণতি একই। ইয়াহিয়া খানরাও ইতিহাসের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। যেমন পায়নি তাদের এ দেশীয় দোসররা। যাদেরকে আজ স্বাধীনতার প্রায় ৪২ বছর পর যুদ্ধাপরাধের দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। কেবল বাংলাদেশীই নয়, পাকিস্তানিসহ সকল মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের যথার্থ বিচার বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাশা করে। প্রকৃত তথ্য, প্রমাণ ও উপাথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকৃত যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত ও সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করে জাতিকে গ্লানিমুক্ত করা সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

Student Work

বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গণদাবী। সকল মত, ধর্ম, পেশা, শ্রেণির জনসাধারণ যুদ্ধপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠিত হবার পক্ষে সোচ্চার। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরোধীতাকারী গুটিকয়েক মানুষ এবং তাদের কিছু সংখ্যক সমর্থক ছাড়া সমগ্র জাতি প্রকৃত যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার পক্ষে। নানা ইস্যুতে দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন মত থাকলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইস্যুতে প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুস্পষ্ট ঐকমত্য প্রতীয়মান।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পটভূমি :

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেই বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রথম জনসভায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারী সরকার "বাংলাদেশ কলাবরেটরস স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল অর্ডার ১৯৭২" প্রণয়ন করে। এর আওতায় ৩৭,৪৭১ ব্যক্তিকে আটক করা হয় এবং ৭৫২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে আলোচিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তৎকালীন সরকার এই আইনটি বাতিল করে। কলাবটেরস অ্যাক্ট বা দালাল আইনে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভব না হওয়ায় ১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনালস্) এ্যাক্ট' প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালের ১৯ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতায় ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীকে ছেড়ে দিতে হয় বাংলাদেশকে। তবে এই আইনটি এখনও বলবৎ আছে। একটি উল্লখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের ১৩ দিনের মাথায় জহির রায়হান গঠন করেছিলেন "বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিশন"। তার নিখোঁজের পর কমিশনের কাজ আর এগোয়নি। তবে বঙ্গবন্ধু কখনোই খুন, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মতো অপরাধ ক্ষমা করেননি।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালে দালাল আইনে সারা দেশে ৬২ টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল। সে সময় ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীকে চিহ্নিত করে বিচার কাজ শুরু হয। এর মধ্যে ৭৫২ জনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল। পঁচাত্তরের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত করা হয় এবং আটক অপরাধীদের ছেড়ে দেয়া হয়। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সেক্টর কমাণ্ডাস ফোরাম, এর আগে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং বর্তমান মহাজোটের শরিক বাম দলগুলোর পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করা হয়। নব্বইয়ের দশকে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে সারা দেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। তখন গণতদন্ত কমিশন করে বেশ কয়েকজনকে প্রতীকী মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

জাতীয় ঐক্য এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার :

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে যুদ্ধপরাধীদের বিচার কার্য শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অভিযোগ প্রমাণ করে রায় ঘোষণা করা হয়েছে। আরো অনেকরে বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এগুলো হলঃ

১. **রাজনৈতিক ঐক্য :** বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে অনেক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে। রাজনৈতিক আদর্শ এবং মতের ভিন্নতা থাকলেও যুদ্ধপরাধীদের বিচার সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এর পক্ষে একটি প্লাটফর্মে একত্রিত করতে পেরেছে।

২. **সামাজিক ঐক্য :** বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক শ্রেণি বিভাগের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শ্রমিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ অন্যান্য শ্রেণি পেশার মানুষও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে একমত।

৩. **মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ঐক্য :** বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ মনে করে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের বহু ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। তাই যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নিরীহ সাধারণ মানুষ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নির্বিচারে হত্যাসহ নির্যাতন করেছে তাদের যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করা না হলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করা যাবে না। সমগ্র জাতি মুক্তিযোদ্ধাদের উপযুক্ত সম্মান নিশ্চিত করার জন্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

৪. **আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখার ঐক্য :** স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে দেশের জনগণ যথেষ্ট সচেতন। যুদ্ধাপরাধীদের মত ঘৃণ্য অপরাধীদের জন্যে উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারলে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। তাই দেশের জনগণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে একত্রিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

৫. **নতুন প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ করা :** বাংলাদেশের যে প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। নতুন প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযোগ্য সম্মান নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রানিত হয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণে নিজেদের ভূমিকা রাখার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। নতুন প্রজন্ম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর পক্ষে নিজেদের সুদৃঢ় অবস্থানকে সুস্পষ্টভাবে জাতির সামনে তুলে ধরেছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই। দ্বিধা বিভক্ত জাতি কখনোই অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অস্তিত্বের প্রশ্নে একমাত্র জাতীয় ঐক্যই পারে জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত করতে। তাই বলা যায়, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

Teacher's Discussion | [redacted] মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি : ১৯৪৭-১৯৭১

ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আর লাখো মা-বোনের সম্ভ্রমহানির মাধ্যমে অর্জিত যে স্বাধীনতা তা একদিনে আমাদের করায়ত্ত হয়নি। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তবেই অর্জন করেছি আমরা এ স্বাধীনতা। তাই মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদেরকে এর পটভূমি জানা দরকার। মুক্তিযুদ্ধের পিছনের ইতিহাস যেমন তিক্ত তেমনি মধুরও। কেননা ইতিহাসের প্রতিটি পর্বে বাংলার জনগণ তাদের শক্তি, সাহস, শৌর্য এবং বীর্যের পরিচয় দিয়েছে। যখনই কোনো ক্রান্তিকাল এসেছে বাংলার দামাল ছেলেরা পিছনে না গিয়ে সগর্বে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি যদিও ব্যাপক এবং বিস্তৃত তবুও এটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য হলো জাতীয় স্মৃতিসৌধ, যা সম্মিলিত প্রয়াস নামেও পরিচিত। এ স্মৃতিসৌধের রয়েছে সাতটি ফলক, যা স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সাতটি পর্যায়ের নিদর্শন স্বরূপ। তাই বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে এ সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের এ সাতটি পর্যায়ে হলো-

ক) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন;
খ) ১৯৫৪ সালের নির্বাচন;
গ) ৫৮-এর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন;
ঘ) ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন বা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন;
ঙ) ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন;
চ) ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং
ছ) ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। এ সাতটি পর্যায়ের ইতিহাস নিম্নরূপে আলোচনা করা যায়।

(ক) বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ:

৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকায় আসেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি ঢাকায় ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে বলেন "Only urdu and urdu shall be the state language of Pakistan" বাঙালী ছাত্র সমাজ সাথে সাথেই জিন্নাহর এই ঘোষনার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং এর মাধ্যমেই সূত্রপাত হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালী জাতির স্বাধীকার আন্দোলনের সূত্রপাত এবং বাংলার মাটিতে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনেরও শুরু এখান থেকেই।

খ) ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন : ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তা অনুষ্ঠিত হলেও, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তখনও কার্যকর ছিল। প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। এর মধ্যে ২৩৭টি আসন (৯টি মহিলাসহ) মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এবং ৭২টি আসন (৬টি মহিলাসহ) অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১৫টি মহিলা আসনের মধ্যে ৯টি মুসলমান, ১ টি বর্ণ হিন্দু এবং দুটি তফসিলি হিন্দু ১ টি পাকিস্তানি খ্রিষ্টান এবং ২টি বৌদ্ধ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ৫৪-এর এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং এ ফ্রন্টের হাতে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় হয়।

যুক্তফ্রন্ট গঠন : যুক্তফ্রন্ট গঠন ছিল একটি প্রধান নির্বাচন কৌশল। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল এর মূল উদ্যোক্তা। এর শরিক দলসমূহ হচ্ছে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩), মওলানা আতাহার আলীর নিজাম-ই-ইসলাম এবং হাজী মোহাম্মদ দানেসের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রী দল। মধ্যপন্থি, গণতন্ত্রী, বামপন্থি ইত্যাদি দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সত্যিকার অর্থে একটি ব্যাপকভিত্তিক জোটের রূপ লাভ করে। মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্য-এ দুয়ের বিরোধিতা ছিল জোটের সাধারণ ভিত্তি।

Scanned by CamScanner

প্রধান নির্বাচনী ইস্যু ঃ 'রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন ও পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি' ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রধান নির্বাচনী ইস্যু। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের নেতারা তাদের নির্বাচনী প্রচারে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে লবণ কেলেঙ্কারির ঘটনা সম্মুখে নিয়ে আসেন। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের সুনির্দিষ্ট কোনো আর্থসামাজিক কর্মসূচি ছিল না। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে এ দলের প্রচারণায় 'ইসলাম বিপন্ন', 'পাকিস্তান বিপন্ন', 'কমিউনিস্ট', 'ভারতীয় চর' ইত্যাদি বক্তব্য প্রাধান্য পায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল (মুসলিম আসন) ঃ যুক্তফ্রন্ট-২২৩; মুসলিম লীগ-৯ (নির্বাচনের পর একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগ দেন); খেলাফত রব্বানী-০১ এবং স্বতন্ত্র-০৪ আসন লাভ করে।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন এবং নির্বাচন উত্তর ঘটনাবলীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের শুধু ভরাডুবিই ঘটেনি, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পূর্ব বাংলা থেকে বস্তুত এ দলের উচ্ছেদ ঘটে। ২১ দফা কর্মসূচির ১৯ নম্বর দফায় বর্ণিত পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ইত্যাদি দাবি আরো জোরদার হয়ে ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পেশকৃত ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচিতে তা সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দ্বিতীয়বার ও চূড়ান্তভাবে মুসলিম লীগের উচ্ছেদ ঘটে। পাকিস্তান অর্জনের পর মুসলিম লীগের জন্য একটি জাতীয়তাবাদী প-াটফরম থেকে কর্মসূচিভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দলে নিজেকে রূপান্তর করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। মুসলিম লীগ তা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বরং শীঘ্রই এ দল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত হয়। '৫৪-এর নির্বাচনে পূর্ব বাংলার শোচনীয় পরাজয়ের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়। এরই অংশ হিসেবে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনা বাঙালিদে প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ৫৪-এর নির্বাচনের পূর্বাপর ঘটনা বাঙালিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ) **১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ও পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঃ** ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। একই সাথে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হয়। সেগুলো হচ্ছে –

১) সংবিধান বাতিল;
২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বরখাস্ত;
৩) জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙে দেয়া;
৪) সকল রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ;
৫) জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ।

সামরিক শাসনের কারণ ঃ সামরিক শাসনের পরপরই প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা উদ্ভূত পরিস্থিতি তুলে ধরে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। তিনি একের পর এক সরকার গঠন এবং তার অস্থায়িত্ব, অবাধ দুর্নীতি, রাজনৈতিক কোনো উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা না থাকা প্রভৃতি বিষয়কে সামরিক শাসনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। সামগ্রিক অবস্থার জন্য তিনি রাজনীতিদের সরাসরি দায়ী করে বলেন, 'আমি একজন নীরব দর্শক হিসেবে দেশ ধ্বংসের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতে পানি না। এ কথা ঠিক যে, ঘনঘন সরকার পরিবর্তন এবং রাজনীতিকদের মধ্যে ক্ষমতার জন্য চরম দ্বন্দ্ব ও বিভেদের কারণে দেশের মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাই বলে এ কারণে সামরিক শাসন জারি হয়নি, সামরিক শাসন জারির ক্ষেত্রে এ পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ নেয়া মাত্র। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে গণতন্ত্র চর্চার প্রাথমিক ক্ষেত্রে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র রচনাসহ কিছু রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। তবে উদ্ভূত অবস্থা সৃষ্টিতে ইস্কান্দার মির্জা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কূট প্রকৃতির এবং ক্ষমতালিপ্সু। নিজ স্বার্থ উদ্ধার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কোনো ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়া, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন্দাল-বিভেদ সৃষ্টি ছিল তার কৌশল। পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা যতই উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, ততই সামরিক, বেসামরিক আমলাগোষ্ঠী ও তাদের প্রতিভূ ইস্কান্দার মির্জা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিশেষ ব্যবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র বনাম সিভিলিয়ান দ্বন্দ্ব কার্যত বাঙালি বনাম পাঞ্জাবি দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। এ দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্টি হয় পূর্ব পাকিস্তানে তুমুল আন্দোলনের, যা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের পথকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করে। আন্দোলনের ফলে ইস্কান্দার মির্জা সরকারের ভিত নড়ে ওঠে। বাঙালি বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

ঘ) **১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন ঃ** ৩টি প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে '৬২- এর আইয়ুব শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিষয়গুলো হচ্ছে- ১. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার, ২. '৬২-এর আইয়ুবী শাসনতন্ত্র, ও ৩. শরিফ কমিশন রিপোর্ট।

Scanned by CamScanner

১) **সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার ও ছাত্র সমাজের প্রতিক্রিয়া ঃ** ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি আইয়ুব সরকার আকস্মিকভাবে করাচিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়। প্রকৃতপক্ষে, আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে কিভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা যায় এ নিয়ে সোহরাওয়ার্দী এ সময়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এ ব্যাপারে কারো কারো সাথে তিনি কথাবার্তাও শুরু করেছিলেন। বিশেষ করে আইয়ুব প্রস্তাবিত নতুন শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার সাথে সাথে যাতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায়, সোহরাওয়ার্দীর দৃষ্টি ছিল সেদিকে। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে প্রথম প্রকাশ্যে আইয়ুব সামরিক শাসন বিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। লৌহ মানব আইয়ুব এত ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠার কথা ভাবতে পারেনি। এ ছাত্র আন্দোলন তার ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ১৯ আগস্ট (১৯৬২) সোগরাওয়ার্দীকে মুক্তি দেয়া হয়।

২) **আইয়ুবী শাসনতন্ত্র বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঃ** ১৯৬২ সালের ১ মার্চ বিচারপতি শাহাবুদ্দীন কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র জারি করেন। এটি আইয়ুবী শাসনতন্ত্র নামে পরিচিত। আইয়ুবের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রিত স্তরভিত্তিক পরোক্ষ নির্বাচনে পদ্ধতি সম্বলিত মৌলিক গণতন্ত্রের ধারণার ওপর এ সংবিধান প্রণীত হয়। গণতন্ত্রবিরোধী, এক ব্যক্তিনির্ভর, কেন্দ্রীভূত এ গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে সেনা-আমলা শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান। নতুন সংবিধানের আওতায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যথাক্রমে ২৮ এপ্রিল ও ৫ মে (১৯৬২) মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোট অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুব প্রবর্তিত এ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক এলিটদের অংশগ্রহণের প্রায় সকল সুযোগই বন্ধ হয়ে যায়। নতুন শাসনতন্ত্র জারি হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব বাংলা আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ছাত্র সমাজ এ শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে। রাজবন্দিদের মুক্তি এবং একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের দাবিতে তারা সোচ্চার হয়।

৩) **শরিফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঃ** একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি আইয়ুব খান শিক্ষা সচিব ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এস এম শরিফকে প্রধান করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। ১৯৬২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্টে বলা হয় ষষ্ঠ থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা, জাতীয় ভাষার জন্য একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা এবং সেক্ষেত্রে আরবির গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা, রোমান বর্ণমালার সাহায্যে পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তের প্রচেষ্টা, শিক্ষাব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে দেখে শিক্ষার্থীর তা বহন করা, অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে 'অবাস্তব কল্পনা' বলে উল্লেখ করা, ডিগ্রি কোর্সকে তিনবছর মেয়াদি করা ইত্যাদি। শরিফ কমিশন রিপোর্টকে ছাত্রসমাজ গণবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল, শিক্ষা সংকোচন, শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে গণ্য, ব্যয়বহুল, বাংলাভাষার বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করে। এ রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে পূর্ব বাংলার ছাত্ররা ব্যাপক সভা-সমাবেশ, প্রচারণা, মিছিল, ধর্মঘট চালিয়ে যেতে থাকে। দ্রুত এ আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নির্বিশেষে সর্বস্তরের ছাত্ররা এতে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলন সর্বদলীয় রূপ নেয়। শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে এত বিশাল আন্দোলন পূর্বে আর কখনো হয়নি। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ছাত্রসমাজ সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতাল আহ্বান করে। ছাত্রদের একটি জঙ্গি মিছিল কার্জন হলের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ অতর্কিত গুলিবর্ষণ করে। ফলে ঘটনাস্থলেই অনেকে নিহত হয়। এতে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৩ দিনব্যাপী শোক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে এক সর্বদলীয় ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সরকার শরিফ কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয়। ছাত্র অভ্যুত্থানের কারণেই সরকার তা করতে বাধ্য হয়।

৬) ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ঃ

১) **উনসত্তরের গণ আন্দোলন ঃ** আগরতলা মামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হতে থাকে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন থেকে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সাত আট মাস ধরে এ মামলার শুনানি ও জেরার কাজ চলেছিল। এ সকল শুনানির বিবরণ প্রত্যেক দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ঐ বিবরণী পাঠ করে বাংলার মানুষ জানতে পারল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ পূর্ব বাংলাকে কি রকম পাশবিকভাবে শোষণ করছিল। তারা আরো বুঝতে পারল যে পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দরুনই শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে। এ অবস্থায় ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারীতে পূর্ব বাংলা ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুইটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য এই সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফায় সঙ্গে আওয়ামী লীগের ৬ দফা সম্মিলিত হয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তি সদস্যরূপে পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে।

Scanned by CamScanner

২) **এগার দফা ঃ** ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবির মূল বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক) ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যান্য অধিকার সংক্রান্ত ১৭টি দাবি, যথা-নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, ছাত্র বেতন হ্রাস, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, মেডিকেল ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রভৃতি;

খ) সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রবর্তন;

গ) পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন;

ঘ) পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে নিয়ে একটি সাব-ফেডারেশন গঠন এবং তার অন্তর্গত প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান;

ঙ) ব্যাংক, বীমা ও সব বড় শিল্পকে জাতীয়করণ করা;

চ) কৃষকদের উপর থেকে খাজনা ও ট্যাক্সের হার কমানো;

ছ) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস প্রদান;

জ) পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) জরুরী আইন, নিরাপত্তা আইন ও সকল নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করা;

ঞ) সিয়াটো, সেন্টো, পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক চুক্তি প্রভৃতি বাতিল করে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করা;

৩) **গণ আন্দোলনের বিস্তার ঃ** এগার দফার দাবিগুলোতে সমাজের সব স্তরের মানুষের দাবি সন্নিবেশিত হয়েছিল। ছয় দফা দাবির মূল বিষয়সমূহও এগার দফা দাবিনামার তিন নম্বর দাবির উপধারারূপে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। ১৯৬৯-এর জানুয়ারীতে যখন মূলত ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহযোগিতায় গঠিত ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গণআন্দোলনের ডাক দেয় তখন সারা দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ সে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। দেশের জনমত তখন এমন তীব্রভাবে আন্দোলনমুখী হয়ে উঠেছিল যে জানুয়ারীর (১৯৬৯) তৃতীয় সপ্তাহে সরকারি ছাত্র সংগঠন হিসাবে পরিচিত এন. এস. এফ দলেও ভাঙ্গন ধরে এবং এর একাংশ এগার দফা আন্দোলনে যোগ দেয়। ঐ সময়ে পুরো গণআন্দোলনটাই পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। ১১ দফা দাবিতে ১৮ জানুয়ারী হতে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। এদিকে পুলিশী নির্যাতনও পূর্ণমাত্রায় চলতে থাকে। ২০ জানুয়ারী ছাত্র বিক্ষোভের তৃতীয় দিবস। ঐ দিন ঢাকার ছাত্র জনতার উপর পুলিশের জুলুম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। ছাত্রদের এক মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলী চালান হয়। পুলিশের গুলীতে ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হয়। ক্রমান্বয়ে এই ছাত্র আন্দোলন একটি গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত এই গণবিক্ষোভকে দমন করার জন্য শাসক গোষ্ঠী সামরিক বাহিনীকে তলব করে। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গুলী চালিয়ে জনগণের এই দুর্বার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয় নি। এসময় পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনও শক্তিশালী হয়। অবশেষে এর নায়ক আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে ফেব্রুয়ারীতে গোল টেবিল বৈঠক আহবান করেন। তিনি 'ডাকের' (ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি) নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমস্যা আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শেখ মুজিব তখনও আগরতলা মামলায় আটক। সুতরাং তাঁকে ছাড়া আলোচনা বৈঠক অনর্থক। এদিকে মওলানা ভাসানী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। শেখ মুজিব প্যারোলে আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন। ইতোমধ্যে গণ-আন্দোলন আরও তীব্র হয়। আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারী বন্দী অবস্থায় কেন্টনমেন্টে গুলী করে হত্যা করা হয়। সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আর এক ধাপ এগিয়ে নেয়। জনতা সেদিন এতই ক্ষিপ্ত হয় যে তারা মামলার প্রধান বিচারকের বাড়ীসহ কয়েকজন মন্ত্রীর বাড়ী, গাড়ী ও গণ স্বার্থবিরোধী পত্রিকা অফিস অগ্নিদাহ করে। পরদিন খবর পাওয়া যায় যে সৈন্যরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের রীডার ড. শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এই সংবাদে সারাদেশে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। অবস্থা আয়ত্তে আনা ও জনগণকে শান্ত করার জন্য তিনি কৌশলের আশ্রয় নেন। গণদাবিতে প্রথমে তিনি পূর্ব বাংলার ধিকৃত গভর্নর মোনেম খানকে বরখাস্ত করেন এবং তৎস্থানে পূর্ব বাংলার অর্থমন্ত্রী ড. এম. এন. হুদাকে নিয়োগ করেন। শীঘ্রই তিনি দেশের জরুরী অবস্থা উঠিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অতঃপর জনগণের রোষ হ্রাস করার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন যে তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন না।

৪) **শেখ মুজিবকে গণসংবর্ধনা ও 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দান ঃ** আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হতে মুক্তি লাভের পর শেখ মুজিবকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে রমনা রেসকোর্স ময়দানে ২৩ ফেব্রুয়ারী এক গণ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় শেখ মুজিবকে বাংলার নিপীড়িত জনগণের জন্য তাঁর ত্যাগ ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেখ মুজিব জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে ঘোষণা করেন, প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকে তিনি অংশ গ্রহণ করে দেশবাসীর অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবেন। যদি তারা উত্থাপিত দাবি অগ্রাহ্য করে তাহলে তিনি দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

৫) **ফলাফল ঃ** শেষ পর্যন্ত স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে সকল আলোচনা ব্যর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে গণ ঐক্য ফ্রন্টও ভেঙ্গে যায়। ইতোমধ্যে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অরাজনীতিক কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। দেশের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার স্বরণাপন্ন হন। ২৫ মার্চ তিনি সমস্ত ক্ষমতা ইয়াহিয়ার নিকট হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সমস্ত ক্ষমতা ইয়াহিয়ার নিকট হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ রাত্রে সারা দেশে দ্বিতীয় বারের মত সামরিক আইন জারী করেন। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র ও জাতীয় পরিষদ বাতিল ঘোষিত হয়। তৎসঙ্গে দীর্ঘ দশ বছরের একনায়কতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর শুরু হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তম অধ্যায়ের নায়ক কলঙ্কিত ইয়াহিয়ার শাসনকাল।

Scanned by CamScanner

চ) **মুক্তিযুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয় ঃ** ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার এই ঘোষণায় জাতি উদ্দীপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে ২৫ মার্চ কালো রাতেই শুরু হয় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর জল্লাদ বাহিনীর বর্বরোচিত নগ্ন হামলায় বন্দি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে শেখ মুজিব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে সকলকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। টানা ০৯ মাস যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এ কে নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ যৌথ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অবশেষে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্থায়ী আসন লাভ করে।

যে কোনো বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পটভূমি না জানলে সে বিষয়ে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করাও দুরূহ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে এক মহান ইতিহাস। এ ইতিহাস পুরোপুরি একটি রচনার পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কোনো বিষয়ের ঐতিহাসিক পটভূমি লিখতে যাওয়া মানে নতুন করে আবার ইতিহাসের ছাত্র হওয়া। এটি যেমন কঠিন তেমনি দুরূহ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক পটভূমি জেনে সে অনুযায়ী অর্থাৎ তাদের আদর্শ অনুযায়ী দেশ গড়ার অঙ্গিকার করা বাঙালি হিসেবে আমাদের কর্তব্য। তাই সকল হানাহানি ভুলে মুক্তিযুদ্ধর যে চেতনা, যে অঙ্গিকার, যে দৃপ্ত শপথ যে অনুযায়ী দেশ গড়ার অঙ্গিকার হওয়াই সকল বাঙালির প্রত্যাশা। তবেই আমরা জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব।

BCS প্রশ্নাবলী — বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

☑ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কি কারণ ছিল তা বিশ্লেষণ করুন। (২৭তম বিসিএস)

Student Work — মুক্তিযুদ্ধের কারণ

ক) সামাজিক কারণ

১) **ভৌগোলিক বৈপরীত্য ঃ** ১৯৪৭ সালের আগষ্টে ভারত ও পাকিস্তান নামে স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে ইংরেজরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। ১২শ মাইল ভারতীয় ভূ-খন্ডের দুপ্রান্তে দুই অংশের অবস্থান। একমাত্র ধর্ম ছাড়া দুই অংশের জনগণের মধ্যে আর কোন মিল ছিলনা। উভয় অংশেই মুসলমানরা ছিল ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ তাদের ভাষা, জাতিগত মিশ্রণ, জীবনধারনের রীতিনীতি এবং দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল একে অপরের চেয়ে ভিন্ন। তাই একই দেশের দুই প্রদেশ হয়েও পূর্ব পাকিস্তান তার স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত হতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়াস পায়।

২) **ভাষাগত বৈষম্য ঃ** পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের ভাষা নিয়ে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের ৫৪.৬% জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আমাদের ভাষাকে হরণ করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং শাসকগোষ্ঠীর সব বেড়াজাল ছিন্ন করে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ভাষা আন্দোলনের এ ঐক্যবদ্ধ চেতনা এদেশের মানুষের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল।

৩) **সাংস্কৃতিক বৈষম্য ঃ** পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানের নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক মিশ্রণের এক কেন্দ্রীভূত নীতি গ্রহণ করে। এ নীতির চাপ অধিকমাত্রায় অনুভূত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব বাংলায় তথা পূর্ব পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সম্পর্কে কতকগুলো ভুল ধারণা পোষণ করত। প্রথমত, বাঙালিরা পুরোপুরি মুসলমান নয়। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আদৌ ইসলামিক নয় এবং তৃতীয়ত, কাশ্মীর সম্পর্কে বাঙালিদের কোনো আগ্রহ নেই। এ বিশ্বাসগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে তারা সমাধান দিতে চেয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে তারা এদেশের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মনোভাব এবং প্রথাগত আচরণের ওপর অনুচিৎ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী এবং সর্বোপরি আপামর জনসাধারণের মধ্যে তীব্র হতাশার সৃষ্টি হয়। তাদের মনে চাপা অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। এ হতাশা এবং অসন্তোষের তীব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে।

৪) **শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যঃ** পশ্চিম পাকিস্তানের দূরভিসন্ধি মূলক পরিকল্পিত নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানের স্কুলগামী ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়লেও স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পায়। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার একই সময়ে এ খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে পশ্চিম পাকিস্তানে স্কুলের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ গুণ বৃদ্ধি করে। পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ধরনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি না করে তা সংকুচিত করার চেষ্টা করেছে।

Scanned by CamScanner

খ) সামরিক কারণ

১) **ক্রমাগত সামরিক অভ্যুত্থানঃ** ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অন্যতম কারণ। ১৯৫৮ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতা দখলের পর থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সামরিক কায়দায় এদেশের মানুষের উপর শোষণ চালাতে থাকে। তাই এ অঞ্চলের সাধারণ জনগণ মুক্তির জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে।

২) **সামরিক বৈষম্য ঃ** পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক বৈষম্য ছিল পর্বত প্রমাণ। দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দফতরই স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অস্ত্র কারখানাগুলোও স্থাপন করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীর চাকুরীগুলো ছিল প্রায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য একচেটিয়া। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মোট ১৭ জন জেনারেল, লেঃ জেনারেল ও মেজর জেনারেলের মধ্যে মাত্র ১ জন মেজর জেনারেল ছিলেন বাঙালি। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর অফিসার শ্রেণীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে ৫%, ১০% ও ১৬%। পাকিস্তানের মোট বার্ষিক আয়ের ৭৫% ও পরে ৬০% ব্যয় হত প্রতিরক্ষা খাতে। আর এ অর্থের সিংহভাগ সুবিধা ভোগ করত পশ্চিম পাকিস্তানীরা।

৩) **১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা ঃ** পাকিস্তান একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের বিরাট শিক্ষা হলো– পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা এবং সামরিক বাহিনী শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের। ভারতের সাথে যে কোনো সম্ভাব্য সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ছিল অরক্ষিত। তাই যুদ্ধের পর বাঙালি নতুন জীবনের রূপরেখা অঙ্কন করল। জন্ম হলো ছয় দফা কর্মসূচির। মূলত এ ছয় দফার পথ ধরেই বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

গ) রাজনৈতিক কারণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল রাজনৈতিক। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব-পাকিস্তান তথা পূর্ব-বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম যে রাজনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস নেওয়া হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বানচাল ও ক্ষমতা হস্তান্তরের অনীহার মধ্য দিয়ে তা একটি রাজনৈতিক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে রাজনৈতিক গতিধারা বিশ্লেষণ করলে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করা যায়। রাজনৈতিক কারণসমূহের বিভিন্ন দিকগুলো নিম্নরূপ-

১) **কেন্দ্রিয় সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিতকরণ ঃ** পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জাতীয় সংহতি জোরদার করার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান নিয়ে একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য ছিল। এক্ষেত্রে বাঙালিরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তারা জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের দাবি করলে তাদের সেই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়।

২) **১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন ঃ** আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জোটবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। প্রভুত্বব্যঞ্জক সরকারের অবসানের জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নেতৃবন্দের সাথে আলোচনার সূত্রপাত ঘটালে আইয়ুব খান ভীত হয়ে ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি করাচিতে তাকে গ্রেপ্তার করেন। সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভের মুখে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদকে গ্রেপ্তার করে। এতে ছাত্র আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

৩) **ছয় দফা আন্দোলন ঃ** আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফাভিত্তিক যে দাবি উত্থাপন করেন তার ওপর ভিত্তি করে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে।

৪) **১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থান ঃ** শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনকে আসামী করে স্বৈরাচারী আইয়ুব খান সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করার মধ্য দিয়ে বাংলার ছাত্র-জনতা ১৯৬৯ সালের যে দুর্বার গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে, আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটায় তা বাঙালিদেরকে একটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা দান করে। ১৯৬৯ সালে ১১ দফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সংগঠিত হয় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান এই আন্দোলনে সামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-আসাদুজ্জামান, নবকুমার ইন্সটিটিউট এর নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর, সেনানিবাসে নিহত হন সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সামুসুজ্জোহা। ছাত্র-শিক্ষকের রক্তভেজা এই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে সাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়।

৫) **১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বানচাল করার ষড়যন্ত্র ঃ** ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আওয়ামীলীগের কাছে হস্তান্তর না করে ইয়াহিয়া খান টালবাহানা শুরু করে। ফলে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ গণ আন্দোলন শুরু করে।

Scanned by CamScanner

৬) **শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ ঃ** ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার যে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেছিল তা বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

৭) **বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ ঃ** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সরকারের লেলিয়ে দেওয়া সামরিক বাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের ওপর বর্বর ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে এবং ২৬ মার্চ থেকে পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

ঘ) অর্থনৈতিক কারণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কারণ ছিল অর্থনৈতিক পটভূমি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনীতি ধ্বংস করে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করে। তাদের দৃষ্টিতে পূর্ব-পকিস্তান ছিল একটি উপনিবেশ মাত্র। শিল্প প্রতিষ্ঠান, বীমা ও ব্যাংক, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি দূতাবাসগুলোর হেড অফিস ছিল পশ্চিম-পাকিস্তান। ফলে বাংলাদেশের অর্জিত মুদ্রা ক্রমাগত পশ্চিম-পাকিস্তানে পাচার হতো। এ মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পক্ষপাতিত্বের জন্য বাংলাদেশে মূলধন গড়ে উঠতে পারেনি। এছাড়া নিম্নলিখিত কারণে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড় গড়ে উঠে –

১) **বিদেশী মুদ্রার ব্যবহার ঃ** বাংলাদেশে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা পশ্চিম-পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তানের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে গণ্য করত। পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়ে না উঠায় পূর্ব-পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের ক্ষমতা নেই এ অজুহাতে এখানকার বৈদেশিক আয়-ব্যয় করা হতো পশ্চিম-পাকিস্তানে।

২) **রপ্তানির তুলনায় আমদানি কম ঃ** পূর্ব-পাকিস্তান যে পরিমাণে রপ্তানি করত আমদানি করত সে তুলনায় অনেক কম। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেশি ছিল। পক্ষান্তরে, পশ্চিম-পাকিস্তানে রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ ছিল বেশি। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় আয়-এর হিসাব প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৫৯ ভাগ পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানি করত এবং আমদানি করত শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র। এ সামান্য অর্থের সিংহভাগ ভোগপণ্য আমদানিতে ব্যয় হওয়ায় উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হতো। পক্ষান্তরে পশ্চিম-পাকিস্তান আলোচ্য সময়ে শতকরা ৪১ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে এবং ব্যয় করে শতকরা ৭০ ভাগ।

৩) **মূলধনের অভাব ঃ** দেশ বিভাগের পর ভারত হতে আগত শিল্পপতিগণ তাদের পুঁজি পশ্চিম-পাকিস্তানে বিনিয়োগ করে। তাছাড়া মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব-পাকিস্তানের আয় পশ্চিম-পাকিস্তানে চলে যেত। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থ ও চেকের মাধ্যমে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আনতে হতো। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে মূলধন গড়ে উঠতে পারেনি।

৪) **পাটের অন্যায্য দাম ঃ** তৎকালীন পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল পাট। পূর্ব-পাকিস্তানের উৎপাদিত পাট হতে বৈদেশিক মুদ্রার দুই-তৃতীয়াংশ আসত। অথচ পাটচাষীকে কোনো দিনই ন্যায্য দাম দেওয়া হয়নি। ফলে তাদের দারিদ্রতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫) **কেন্দ্রিয় রাজধানী ঃ** পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় রাজধানী জনবহুল পূর্ব-পাকিস্তানে স্থাপিত না হয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানে স্থাপিত হওয়ায় কেন্দ্রিয় বাজেটের বিরাট অংশ সেখানেই খরচ হতো। কেন্দ্রিয় রাজধানী পশ্চিম-পাকিস্তানে হওয়ায় কেন্দ্রিয় সরকারের সকল হেড অফিস, দেশরক্ষা সদর দফতর ও শিক্ষায়তন, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনসমূহ, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ন্যাশনাল ব্যাংক, বীমা, অন্যান্য প্রায় সকল ব্যাংক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানাদিও পশ্চিম-পাকিস্তানে স্থাপিত হয়।

৬) **বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য বণ্টনে অবিবেচনা ঃ** বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ভিত্তিতে বিদেশ হতে বিপুল পরিমাণ ঋণ ও সাহায্য আসত এবং সেই ঋণের সুদ বাংলাদেশকেই বহন করতে হতো। অথচ বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের শতকরা ১০-১৫ ভাগ মাত্র বাংলাদেশের জন্য ব্যয় হতো। পাকিস্তানকে চীন ১৯৬৫ সালে ঋণ দেয় ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে মাত্র ১,২৫,০০০ ডলার পূর্ব-পাকিস্তানের পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়।

৭) **মাথাপিছু আয় বৈষম্য ঃ** পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের তুলনায় পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বেশি ছিল এবং এ মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের তুলনায় ৩২% বেশি। ১৯৬৯-৭০ সালে এ পার্থক্যের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ৬১%।

৮) **রাজস্ব বণ্টনে অবিবেচনা ঃ** দেশের দু'অংশের উন্নয়ন খাতে রাজস্ব বণ্টন কখনোই লোকসংখ্যা অনুপাতে করা হতো না। মোট রাজস্বের ৬০% আয় হতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হতো মাত্র ২৫%। অপরপক্ষে, পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আয় হতো ৪০%। অথচ সেখানে ব্যয় করা হতো ৭৫%।

৯) **ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস ঃ** বাংলাদেশে স্থাপিত এমন অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল যাদের হেড অফিস করাচিতে ছিল। এ প্রতিষ্ঠানগুলো করাচিতে কর প্রদান করত। ফলে পূর্ব-পাকিস্তান রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হতো।

১০) **উন্নয়ন খাতে অবিবেচনামূলক বরাদ্দ ঃ** পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা আর্থিক বছর ফুরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগেই দেওয়া হতো। ফলে প্রতি বছর অব্যবহৃত টাকা কেন্দ্রের হাতে ফেরত চলে যেত। পশ্চিম-পাকিস্তানের বেলায় আবার সেরূপ ঘটত না।

Scanned by CamScanner

১১) **ব্যাংকের ঋণ ঃ** পাকিস্তানের ব্যাংক জনসাধারণকে যে ঋণ প্রদান করত তার শতকরা মাত্র ৩৩ ভাগ পূর্ব-পাকিস্তান পেত। কৃষি উন্নয়নের জন্য পাকিস্তান কৃষি ব্যাংক ঋণ দেয় ৬০০ কোটি টাকা। এ ঋণের সিংহভাগ লাভ করেছে পশ্চিম-পাকিস্তানীরা।

১২) **বিদ্যুৎ উন্নয়ন ক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ** পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বিদ্যুৎ উন্নয়ন ক্ষেত্রে বৈষম্য নীতি অনুসরণ করেছিল। বিভিন্নভাবে পূর্ব-পাকিস্তানে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭% ও ৮৩%।

১৩) **পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় ঃ** পশ্চিম-পাকিস্তান বহির্ভূত বহু প্রকল্পে টাকা খরচ করা হয়। সেচ প্রকল্পের নামে পশ্চিম-পাকিস্তানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষি ভূমিকে সর্বনাশা বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি।

১৪) **অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল পশ্চিম-পাকিস্তান ঃ** কেন্দ্রিয় সরকারের সকল কার্যালয়, দেশ রক্ষা সদর দফতর ও শিক্ষায়তসহ স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান, ন্যাশনাল ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশনসমূহ, বৈদেশিক দূতাবাস, আন্তর্জাতিক ইত্যাদির ন্যায় সকল সরকারি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানাদির প্রধান কেন্দ্রগুলো অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ পূর্ব-পাকিস্তানের অর্জিত অর্থ দিয়ে এ সকল উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যাপারে কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের ১৬টির মধ্যে ১৩টি পশ্চিম-পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল।

১৫) **পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান ঃ** ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স ও বৈদেশিক আমদানির সকল সুযোগ-সুবিধা পক্ষপাতমূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয়। বাংলাদেশে উৎপন্ন নিউজপ্রিন্ট ও অন্যান্য কাগজের ব্যবসার কর্তৃত্ব করত পশ্চিম-পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা। তাদের কারসাজিতে বাংলাদেশের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানীদের তুলনায় অধিক মূল্যে কাগজ ক্রয় করত। বিশেষ সুবিধা ভোগ করায় ব্যাংক ও বীমা শিল্পের যথাক্রমে ৮০ ভাগ ও ৭০ ভাগের মালিকানা তাদের হাতে ছিল।

১৬) **প্রশাসনিক বৈষম্য ঃ** ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আমলা ছিলেন ৯৫ জন। এর মধ্যে বাঙালী ছিলেন মাত্র ৭ জন। ১৯৪৭-৬৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণীর বাঙালী কর্মকর্তা ছিলেন শতকরা ২০ ভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ২৬ ভাগ, তৃতীয় শ্রেণীর ২৭ ভাগ এবং চতুর্থ শ্রেণীর শতকরা ৩০ ভাগ। সামরিক বাহিনীতে বাঙালীদের অংশ গ্রহণ ছিল নাম মাত্র। এ সকল বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ যৌক্তিক হয়ে পড়ে।

১৭) **চাকুরীক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ** পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানে ৯৫ জন আই.সি.এস ও আই.পি.অফিসারের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন বাঙালি। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে মোট ১৯৩ জন সচিব, যুগ্মসচিব ও উপসচিবের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ১৩ জন এবং তাঁদের কেউ সচিবের পদে ছিলেন না। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের চিত্রটি ছিল কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ১৭ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ২ জন বাঙালি সচিব এবং সচিবালয়ে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ২১% ভাগ। পূর্ব বাংলায় শিক্ষার হার বেশী থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদে নিয়োগের ব্যাপারে ছিল চরম বৈষম্য।

১৮) **শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ** শিক্ষাক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে চরম অসম অবস্থা বিরাজমান ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী কয়েক বছর পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অনগ্রসর ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক এগিয়ে যায়।

১৯) **আন্তঃপ্রদেশ বাণিজ্য বৈষম্য ঃ** পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি দ্রব্যাদি পূর্ব পাকিস্তানে বিক্রি করা হতো এবং এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারে পরিণত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান।

২০) **কৃষিক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ** কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনুরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে সরকারি অর্থ বণ্টন বরাবরই পশ্চিম পাকিস্তানকে অনুগ্রহ করেছে পূর্ব পাকিস্তানের বদৌলতে।

২১) **বৈদেশিক সাহায্যব্যবহারে বৈষম্য ঃ** ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের চীনের কাছ থেকে ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋন গ্রহণ করে। এ থেকে মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার ব্যয় করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে। অথচ এই ঋণ শোধ করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের পাট রপ্তানির মাধ্যমে। এভাবে বিভিন্ন পর্বে বিদেশী সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান বৈষম্যের শিকার হয়। উদাহরণস্বরূপ সিন্ধু অববাহিকায় দু'টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তাবায়নে ব্যয় করা হয় ১৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেক্ষেত্রে (১৯৪৯-৬৪) পাঁচ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় ১৪৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান :
অথবা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রাণশক্তি হিসেবে বাঙালি সংস্কৃতি :

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তাছাড়া সৃষ্টির কোনো জীবই পরাধীন থাকতে চায় না। ব্যক্তি, জাতি সবাই চায় স্বকীয় সত্তার বিকাশ ঘটাতে। তদ্রুপ বাঙালি জাতিও তার নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাষা-সাহিত্য, জীবনাচরণ প্রভৃতির বিকাশ ঘটাতে ছিল বদ্ধপরিকর। তাই এ জাতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়, অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে তীব্র প্রতিবাদ। শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলন। বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির রয়েছে অসামান্য অবদান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনার পূর্বে সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেয়া আবশ্যক।

সংস্কৃতি কি : সংস্কৃতি হলো মানুষের আচার-আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা, বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈতিকতা, রাজনীতি, ভাষা, কলা, মূল্যবোধ সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে দক্ষতার সর্বাধিক সমাবেশ। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে বাঁচা।' সংস্কৃতি সম্পর্কে এমারসন বলেন, 'সংস্কৃতিই খুলে দেয় সুন্দরের চেতনার দরজা'। সংস্কৃতি সম্পর্কে ম্যাথু আর্নল্ড-এর অভিমত হলো, 'সংস্কৃতিই আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্বের সর্বোত্তম জিনিসগুলোর সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে মানুষের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে।' আবার কালটাজার গ্রাসিয়ান বলেন, 'মানুষ জন্মায় বর্বর হয়ে, সংস্কৃতিই তাকে করে সুসভ্য'। তবে সংস্কৃতি শনাক্তকরণের কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই, গন্ডি নেই। এটি চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি। এলাকাভিত্তিক এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একটা নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের জীবন প্রণালী অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, কাজকর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রচলিত লোককাহিনী, ধর্মীয় উৎসব- অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, চিন্তা-চেতনা সবকিছুই সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে।

স্বাধীনতা-পূর্ব বাঙ্গালি সংস্কৃতি : বাংলাদেশের সংস্কৃতির রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। এ দেশের পথে প্রান্তরে সহজ-সরল বিশ্বাসী মানুষের পদচারণা, কাব্য ও শিল্পচর্চা প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়।

এ দেশের সাহিত্যে গীতি প্রবণতা ও সঙ্গীতের প্রাধান্য দেখা যায় সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই। বাংলার ভাটিয়ালি, যাত্রা, বাউল, মুর্শিদী, মারফতী পালাকীর্তন, কবিগান ইত্যাদির মধ্যে বাংলার অন্তরের সুরটি ধ্বনিত হয়। স্বাধীনতা-পূর্ব কালের বাংলা সংস্কৃতির পরিমন্ডলে এসব আচার অনুষ্ঠানের চর্চা উপস্থিত ছিল বেশ ভালোভাবেই। এখানে বাস করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ আর বাংলা সংস্কৃতি, সকল জাতির সকল স্তরের মানুষের মিলিত মানস-চর্চার বহিঃপ্রকাশ। একে অপরের ভিতর পারস্পরিকতা, হৃদ্যতা, সৌহার্দ্যতা, মমত্ববোধ সেই অনেক জনম থেকেই প্রবল। বাংলাদেশের সংস্কৃতির ভিতর যে ধর্মীয় রীতিনীতি, উৎসব, লোকসাহিত্য, সঙ্গীত, ঋতু উৎসব, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সামাজিক প্রথা রয়েছে তা বহুকাল পূর্ব থেকে চলে আসছে। তবে বিভিন্ন সময়ে কালের আবর্তে সংস্কৃতির চলমান ধারায় বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্ধন ও সমৃদ্ধির ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও পাকিস্তানী আমলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সামাজিক কারণে এ দেশের মানুষ অকেখানি কোণঠাসা অবস্থার মধ্যে পড়ে। ফলে সেই ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ধারা বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি এ দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির অস্তিত্বও অনেকখানি নাজুক হয়ে পরে। এদেশের ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি উপাদানের নাজুক অবস্থার জন্য মূলত পশ্চিমা শোষক শ্রেণীই ছিল দায়ী।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান : বাঙ্গালি জাতি সংগ্রামী জাতি। এ জাতি পরাধীনতার গ্লানিকে কখনই মেনে নেয়নি। তাই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যখন এ দেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তখন এ দেশের ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত- অশিক্ষিত সবাই এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলে, শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলন। নিচে স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান তুলে ধরা হলো :

১. **ভাষার দাবি আদায় :** বাঙালি জাতির মুক্তির প্রথম ধাপ হলো ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলন পরবর্তী সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এ আন্দোলন এ দেশের মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এ আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানিদেরকে ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা দিয়েছে। একুশের চেতনা আমাদেরকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরিমেয় ইন্ধন যুগিয়েছে। এটি ছিল বাঙালিদের মুক্তির প্রথম আন্দোলন। একুশের চেতনা সকল স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভাষা আন্দোলন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যার পরিণতিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।

২. **কবি ও কবিতায় মুক্তির আহবান :** কবি, কবিতা ও সাহিত্য সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়সমৃদ্ধ হয়ে অনেক কবি তাই জ্বালাময়ী কবিতা রচনা করেছেন। নিচে এরুপ কিছু কবি ও তাদের কবিতা উল্লেখ করা হলো :

ক. **জসীম উদ্দীন :** মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসেন পল্লীকবি জসীম উদ্দিন। ১৯৭১ সালের ২ মে ধ্বংসযজ্ঞ শুরুর পরপরই তিনি লিখেছেন 'দখলগ্রাম' ও 'মুক্তিযোদ্ধা' কবিতা। তিনি সহজ সরল ভাষায় লিখেছেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের নগ্ন ইতিহাস-

"মার কোল হতে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল যে খান খান
পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্তস্নান।

যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে অবরুদ্ধ বয়োবৃদ্ধ কবি যেন মানসিকভাবে মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হয়েছেন-

"আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মৃত্যু পিছনে আগে
ভয়াল বিশাল নখর মেলিয়া দিবস রজনী জাগি।"

Scanned by CamScanner

খ. **সুফিয়া কামাল :** ১৯৭১ সালের ২ মার্চ সোনার বাংলা খচিত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের যে চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল, বাঙালি জাতীয় চেতনার যে ঐক্য সংগঠিত হয়েছিল তার প্রকাশ যেসব কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে তার মধ্যে সুফিয়া কামাল অন্যতম। বেগম সুফিয়া কামাল তার 'প্রথম শহীদ বাংলাদেশের মেয়ে' কবিতায় এ চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশকে পাক হানাদার মুক্ত করার দীপ্তশপথ নিয়ে যে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে ত্যাগ স্বীকার করেছিল, সবাই প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত হয়েছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে কবি বেগম সুফিয়া কামালের কবিতায়।

গ. **আবুল হোসেন :** বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে অগ্রজ আবুল হোসেন'পুত্রদের প্রতি' কবিতায় এক বাঁশিওয়ালার কথা বলেছেন, হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো যিনি সব ছেলেদের ঘরছাড়া করবেন, যারা আর ফিরবে না, যাদের মুখ আর দেখা যাবে না। স্বাধীনতা আর মুক্তির জন্য একটি পুরো প্রজন্ম ঘরছাড়া হলো। কেউ তাদের সেদিন ধরে রাখতে পারেনি ঘরে।

ঘ. **শামসুর রাহমান :** একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শ্বাসরুদ্ধকর, ভয়াবহ বন্দিদশা তথা মুক্তিযুদ্ধে মানুষের একাত্মতা সবচেয়ে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে শামসুর রাহমানের কবিতায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যের কবিতায় অবরুদ্ধ ঢাকার চিত্রকল্প চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে–

"এ বন্দী শিবিরে
মাথা খুঁড়ে মরলেও পারি না করতে উচ্চারণ
মনের মতন শব্দ কোনো।
মনের মতন সব কবিতা লেখার
অধিকার ওরা
করেছে হরণ।"

সুতরাং দেখা যায় যে, এই কবিরাই সময়ের দাবি, মুক্তির বার্তা, অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে কবিতা লিখে, সাহিত্য রচনা করে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে করেছেন আরও বেগবান, সহজ।

৩. **অর্থনৈতিক অধিকার আদায় :** অর্থনৈতিক মুক্তি স্বকীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদিও ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর প্রায় একই রুপ ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনুসৃত নীতির ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার (১৯৬৫-৭০) ঘোষিত লক্ষ্য ছিল দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৯৬৪-৬৫ সালে যেখানে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য ছিল ৪৬%, সেখানে ১৯৬৯-৭০ সালে এ বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬০%। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারই ছিল এ বৈষম্যের মূল কারণ। এক হিসাব অনুসারে ১৯৪৮-৬৯ সালের মধ্যে মোট ৪১৯ কোটি টাকার সম্পদ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হয়। তাছাড়া বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য অংশ দেয়া হয়নি। ১৯৫০-৬৯ সালের মধ্যে পাকিস্তান ৫৬৮৩ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। তার মাত্র ৩৪% পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয়। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম ও সম্পদের বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের রক্ষিত বাজারে পরিণত হয়। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত শিল্পসম্পদের ৩৪% এর মালিক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিগণ। সুতরাং বাঙ্গালিদের চোখে পশ্চিম পাকিস্তানিরা শোষক হিসেবেই প্রতিভাত হয়। এই শোষক শ্রেণীর কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য বাঙ্গালি জাতি সংগ্রামের পথ বেছে নেয়।

৪. **রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন :** পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে সংঘাতের অন্যতম কারণ ছিল রাজনীতি ও প্রশাসনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অধিপত্য। ১৯৪৭-৫৮ সালে পাকিস্তানে সংসদীয় পদ্ধতি চালু ছিল। পাকিস্তানের প্রথম আইন পরিষদে বাঙ্গালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিংবা সংখ্যাসাম্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক প্রাধান্য ঠেকাতে পারেনি। তার কারণ, শাসকদলের নেতৃত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে বাঙ্গালিদের যেটুকু সুযোগ ছিল, আইয়ুব খানের শাসন আমলে সেটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। ১৯৫৮ হতে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল আইয়ুব খানের হাতে এবং তার শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টারা প্রায় সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। সামরিক ও বেসামরিক আমলাবর্গ, যারা আইয়ুব আমলে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন তাদের মধ্যে বাঙ্গালির সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে, ১৯৬৪-৬৫ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ১৭ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ২ জন এবং ১৭ জন সর্বোচ্চ সামরিক অফিসারের মধ্যে মাত্র ১ জন বাঙ্গালি ছিলেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। তার মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব-বাংলাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। কিন্তু আইয়ুব সরকার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য আগরতল ষড়যন্ত্র মামলাসহ কঠোর দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে।

তার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ তথা আওয়ামী লীগ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় প্রদান করে। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এ গণরায়কে সম্পূর্ণরুপে অগ্রাহ্য করে অস্ত্রের জোরে তারা অধিপত্য ও শোষণ বজায় রাখতে চায় এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙ্গালিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানি আক্রমণের মুখে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও বিপ্লবী সরকার গঠন করে। সকল শ্রেণীর মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং ৯ মাসব্যাপী সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে বাঙ্গালিরা তাদের নিজেদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

পরাধীন জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করতে পারে না, একে অন্যের সংস্কৃতির আজ্ঞাবহ হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। তাইতো বাঙ্গালি জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষায়, বিকাশে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, গড়ে তোলে আন্দোলন, শুরু হয় মুক্তির সংগ্রাম। এই স্বতন্ত্র চিন্তা চেতনাই এক সময় বাঙ্গালিকে এনে দেয় স্বতন্ত্র আবাসভূমি। বিশ্বের বুকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় বাংলাদেশ।

Scanned by CamScanner

Student Work

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত :

(৩৩তম বিসিএস)

বাংলার বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে ভূমি ও রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন। ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস বড়লাট হয়ে বাংলায় এসে রাজস্ব সংস্কারের লক্ষ্যে একজন বিশেষজ্ঞ জন শোরকে দায়িত্ব দেন। ১৭৮৬-৮৯ পর্যন্ত দীর্ঘ গবেষণা শেষে তার রিপোর্টের ভিত্তিতে কর্নওয়ালিস ১৭৯০ সালে একটি দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এ দশসালার ওপর ভিত্তি করে তিনি ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ একে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল বৈশিষ্ট্য হলো :

১. জমিদারগণকে বাৎসরিক নির্দিষ্ট হারে রাজস্বের বিনিময়ে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়।
২. জমির ওপর জমিদারদের মালিকানা, ক্ষমতা এবং অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩. জমিদারগণ যে কোনো শর্তানুসারে জমি ইজারাদানের ক্ষমতা লাভ করে।
৪. ভূমি রাজস্বের কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে দিতে অসমর্থ হলে জমি নিলামে বিক্রি করার অধিকার সরকারের হাতে থাকে (এ নিয়ম 'সূর্যাস্ত আইন' নামে পরিচিত)।
৫. তবে রাজস্ব আদায় ও বিচার ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জনগণের জন্য ছিল অভিশাপস্বরূপ। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণ ও তোষণ নীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

আওয়ামী লীগের ৬- দফা :

(৩৩তম বিসিএস)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছয় দফা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত বৈষম্য ও শোষণনীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রশ্নে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দেশবরেণ্য নেতা ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সম্বলিত ৬ দফাভিত্তিক এক কর্মসূচি প্রথম ব্যক্ত করেন। ইতিহাসে এটিই 'ছয় দফা কর্মসূচি' নামে পরিচিত।

দফাসমূহ :

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্ররূপে গড়তে হবে। এতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং আইণ্ডলো হবে সার্বভৌম। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে।
২. কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। এ ব্যবস্থায় বিকল্পস্বরূপ দুই অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে একই মুদ্রা থাকতে পারে।
৪. সকল প্রকার কর, খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের নির্দিষ্ট একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, যা দিয়ে ফেডারেল তহবিল গড়ে উঠবে।
৫. বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিসাব রাখতে হবে। এক অঞ্চলের আয়কৃত অর্থ সেই অঞ্চলেই ব্যয় হবে। তবে কেন্দ্র এ আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ পাবে।
৬. অঙ্গরাজ্যগুলো তাদের আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের অধিকার থাকবে।

ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় 'মুক্তির সনদ'। ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অসমতা কমে আসত এবং পাকিস্তান একটি শক্তিশালী ফেডারেল রাষ্ট্ররূপে বিকাশ লাভ করতে পারত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একগুঁয়েমির ফলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

Scanned by CamScanner

১৯৭০-এ আওয়ামী লীগের বিজয়ের মূল তাৎপর্য : (৩৫তম বিসিএস)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা পুরাতন রাজনৈতিক দল। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত এ দলটি শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের স্বার্থে একটি বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করে। জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক দল। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবরের তৃতীয় কাউন্সিল সভায় ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হিসেবে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। পাকিস্তানি শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি, এক মানুষ এক ভোট, গণতন্ত্র, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, সংসদীয় সরকার পদ্ধতি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি ছিল আওয়ামী লীগের দাবি। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ তদানীন্তন পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মত সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, যতশীঘ্র তিনি প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। নানা জল্পনা-কল্পনা শেষে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়। প্রতীক বরাদ্দের পরপরই শুরু হয় নির্বাচনী প্রচারাভিযান। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে নির্বাচনের পূর্বে জাতির উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর রেডিও-টেলিভিশনে একটি ভাষণ প্রদান করে ৬-দফা ও ১১-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে তার নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে নির্বাচনী প্রচারাভিযানকালে এ সাধারণ নির্বাচনকে ৬ দফা কর্মসূচীর উপর 'গণভোট' বলে আখ্যায়িত করেন। ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতি প্রথমবারের মতো আত্মপ্রতিষ্ঠার ও স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ লাভ করে। জাতির আত্মবিশ্বাস ছিল যে, নির্বাচনে বিজয় অর্জিত হলেই ছয় দফার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। তাই বাংলার জনগণ একচেটিয়াভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে ছয় দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনসহ ১৬৭টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি (পিপিপি) অর্জন করে মহিলা আসনসহ ৮৮টি আসন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগে। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখে। অপরদিকে আওয়ামী লীগের এ অভূতপূর্ব বিজয়ে পাকিস্তানের কুচক্রীমহল শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা এ নির্বাচনকে বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এমনকি তারা সংসদীয় রীতি-নীতিকে অমান্য করে শেখ মুজিবকে সরকার গঠন করার সুযোগ না দিয়ে নিরীহ বাঙ্গালিদের হত্যার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। এ অবস্থায় শেখ মুজিব জনগণের মনোভাব অবলোকন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। পরবর্তীতে তার ডাকে সাড়া দিয়ে জনগণ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলতে পারি, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করেছিল। বাঙ্গালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং অকাতরে জীবন বিসর্জন দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই বাংলার লাখ লাখ মানুষ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাদের তাজা রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতার পতাকা ছিনিয়ে আনে।

১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়ার তাৎপর্য : (৩৫তম বিসিএস)

প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল স্বার্থ রক্ষায় এক দিকে আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখে, অন্যদিকে সংসদ ও প্রাদেশিক সরকারের সদস্যগণ সর্বত্র সোচ্চার হতে থাকেন। অবশ্য মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের দুই নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং পাকিস্তানের জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে মওলানা ভাসানী ছিলেন আপোসহীন। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী নীতির ঘোরবিরোধী। অন্যদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নীতি ছিল কিছু নমনীয়, অনেকটা ডানপন্থি। তাই আওয়ামী লীগের মধ্যে মওলানা ভাসানীর বামঘেঁষা নীতি এবং সোহরাওয়ার্দীর ডানপন্থার মধ্যে দেখা দেয় সংঘাত। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত 'রূপমহল' সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের তিন দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো সংগঠনের দ্বার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা। পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অসাসম্প্রদায়িকীকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

পক্ষান্তরে সংগঠনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিবর্তনের প্রবক্তা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ২২ অক্টোবর ১৯৫৫ রাত প্রায় ৪ টার দিকে হোসেন সোহরাওয়ার্দী তার আপত্তি প্রত্যাহার করলে সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ করার সিদ্ধান্ত স্থির হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালি রাজনৈতিক নেতৃত্ব সুদূরপ্রসারী যেসব কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ করেন তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **পূর্ব পাকিস্তানে পালিত ধর্ম :** পূর্ব পাকিস্তান তথা পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। দীর্ঘদিনের ইতিহাসের ধারায় এখানে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী যেমন শাসন করেছে, তেমনি বিকাশ লাভ করেছে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি আর বিশ্বাস। এ দেশের ৯০ % লোক ছিল মুসলমান। দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিসেবে ছিল হিন্দু। অন্যদিকে স্বল্পসংখ্যক বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। তাই জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে এক রাজনৈতিক ধারায় পরিচালিত হওয়ার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম আওয়ামী লীগ করা হয়।

২. **আন্দোলন-সংগ্রামে ধর্মনিরপেক্ষতা :** ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যায়, এ দেশের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন এ দেশের মানুষ ধর্মীয় বাদ-বিচারের উর্ধ্বে ওঠে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়েছে। পাকিস্তানি শাসকরা যখন ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙ্গালি জাতিকে শোষণ করছিল, তখন এ দেশের মানুষ সে শুভংকরের ফাঁকি ঠিকই বুঝতে পেরেছে। এ দেশের মানুষ জেনেছে ধর্মের দোহাই দিয়ে শোষণ করা কোনো শাসকের কাজ নয়।

Scanned by CamScanner

৩. **৫২ এর ভাষা আন্দোলন :** ইসলামী ঐক্যের নামে পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঙ্গালিদের ওপর চাপিয়ে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলে পূর্ব-বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় মনস্তাত্ত্বিকভাবে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি সুপ্ত বাঙ্গালি স্বাতন্ত্র্যবোধকে পুনর্জাগরিত করে এবং মুসলিম জাতিয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব-বাংলায় বিরোধী দল তথা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে। এ বিষয়টিও আওয়ামী লীগের নাম আওয়ামী লীগ করার একটি অন্যতম কারণ।

৪. **১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল :** পাকিস্তানের শাসকদল মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের স্বায়ত্তশাসন দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে আখ্যায়িত করে এবং ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রধান নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন লাভ করে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসন সহ মোট সংখ্যা ২৩৬। মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৭টি আসন। যুক্তফ্রন্টের ২২৮টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ পায় ১৪৩টি আসন, কৃষক শ্রমিক পার্টি ৪৮, নেজামে ইসলাম ২২, গণতন্ত্রী দল ১৩, এবং খেলাফতে রববানী পার্টি পায় ২টি আসন। অমুসলিম আসনে কংগ্রেস পায় ২৫টি, তফসিলী ফেডারেশন ২৭টি এবং সংখ্যালঘুদের যুক্তফ্রন্ট পায় ১৩টি আসন।

১৯৫৪ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে আরও প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব-বাংলার জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং শুধু ধর্মের নামে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা যাবে না।

বাংলাদেশের লোকশিল্প :

প্রচীন কাল থেকেই বাঙ্গালিরা মৌসুমী কাজের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে হরেক রকমের কারুশিল্প সৃষ্টি করতো। এগুলোর মধ্যে সুচি শিল্প, তাঁত শিল্প, নকশি কাঁথা ও মসলিন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গৃহিণীরা কাজের বিশ্রামে নকশিকাঁথা কিংবা নানারুপ কারুময় শিল্পকলা অনায়াসে সৃষ্টি করে ফেলতো। এসবের সুনাম বহুকাল আগে বিদেশেও ছড়িয়েছে। আমাদের লোকশিল্প আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের পরিচায়ক।

লোকশিল্পের পরিচয় : লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি। এর পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং প্রকৃতি এত বিচিত্র যে, এককথায় এর সংজ্ঞা নিরুপণ করা যায় না। অগাষ্ট প্যানিয়েলা (August Panyella) বলেন, লোকশিল্পের কেবল 'শিল্প' শব্দ বোঝা কঠিন নয়, 'লোক' শব্দও সমান সমস্যাপূর্ণ। তাঁর ভাষায়, `In the expression `Folk art' it is not only the word `art' that is difficult to understand, the word `Folk' is equally problematic.'

Webster's New Collegiate Dictionary 'লোক'-এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছে : The great proportion of the members of a people the determines the group character and the tends to preserve its characteristics form of civilization and its customs, arts and crafts, legends, traditions and superstitions from generation to generation.

অর্থাৎ 'লোক' হলো সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ যারা গোষ্ঠীচরিত্র নির্ধারণ করে এবং সভ্যতা, আচার, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, পুরাণ, চারু ও কারুশিল্পের বিশিষ্ট রুপকে বংশপরম্পরায় ধরে রাখে।

আর 'শিল্প' হলো মানব আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। শিল্প মানুষের সত্তার গভীরতম প্রকাশ। এবার দেখা যাক একত্রে লোকশিল্পকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

সবচেয়ে সহজলভ্য উপাদান মাটি থেকে আরম্ভ করে কাঠ, বাঁশ, বেত, পাতা, সুতা, লোহা, তামা-সোনা-রুপা, ধাতব দ্রব্য, সোলা, পাট, পুঁতি, ঝিনুক, চামড়া পর্যন্ত নানা উপাদান লোকশিল্প নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, কাঁসারু, সোনারু, শাঁখারি, পটুয়া প্রভৃতি পেশাদার এবং অন্য অনেক অপেশাদার নর-নারী লোকশিল্পের নির্মাতা। এরুপ বিভিন্ন ও শ্রেণী প্রকৃতির লোকশিল্পের সংজ্ঞায়ন সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় এরই প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'Although the definition of the folk art is not get firm, it may be considered as the art created among groups that exist within the framework of a developed society but for geographically or cultural reason, are largely separated from the sophisticated artistic developments of their time and that produced distinctive styles and objects for local needs and tastes.'

অর্থাৎ যদিও লোকশিল্পের সংজ্ঞা এখনো নির্ণয় করা হয়নি, তবু গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যারা উন্নত সমাজের কাঠামোর মধ্যেই বিরাজ করে কিন্তু ভৌগোলিক অথবা সাংস্কৃতিক কারণে শিল্পের উন্নত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাদের নির্মিত এই শিল্পকে লোকশিল্পরুপে বিবেচনা করা যায়, অবশ্য স্থানীয় চাহিদা ও রুচির কারণে এই শিল্প স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসূচক রীতি ও বস্তুগুণ ধারণ করে।

লোকশিল্পেরঅপর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন হ্যারল্ড ওসবোর্ন (Harold Osborne)। তিনি লিখেছেন, 'Objects and decorations made in a traditional fashion by craftsmen without formal training, either for daily use and ornament or for special occasion such as wedding and funerals are called folk art.'

অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পায়নি এমন কারুশিল্পী প্রথাগত যেসব বস্তু ও সরঞ্জাম প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার, অলংকরণ, বিবাহ বা মৃতের সৎকারের কাজে তৈরি করে, সেসব শিল্পবস্তুকে লোকশিল্প বলে।

Scanned by CamScanner

লোকশিল্পের ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে সত্য, তবে এর নান্দনিক ও রসগত মূল্য উপেক্ষা করলে চলে না। সব কাঁথা লোকশিল্পের নমুনা নয়, নকশি কাঁথাই লোকশিল্পের নিদর্শনরূপে গণ্য হয়। কেননা এতে চিত্র আছে, রঙের ব্যবহার আছে, মটিফের বিন্যাস আছে, সর্বোপরি শিল্পীমনের স্পর্শ আছে। কুমার দেবমূর্তি গড়ে, তার হাতের স্পর্শে কোনোটি মনসা, কোনোটি সরস্বতী দেবীর রূপ লাভ করে, সৃজনশীলতার গুণেই এটি সম্ভব হয়। ব্রতের আল্পনায় ধর্মীয় আবেগ, বিয়ের আল্পনায় নান্দনিক আবেগ এবং একুশের আল্পনায় জাতীয়তার আবেগ আছে। চিত্রবস্তুর নির্বাচনে ও বিন্যাসে এরূপ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এখানে শিল্পীর ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না পেলেও পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এক ধরনের হাতে-কলমে শিক্ষা পায় তারা, বাকিটা স্বভাব-প্রতিভার গুণে সৃষ্টির কাজ চালিয়ে নেয়। সুতরাং লোকশিল্পী পূর্বপুরুষের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমাজের মানুষের চাহিদা ও উপযোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রথাগতভাবে যে শিল্প গড়ে, তাকেই লোকশিল্প হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়।

দ্বি-জাতি তত্ত্ব :

পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা। 'একজাতি একরাষ্ট্র' এটিই হচ্ছে দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূলমন্ত্র। তার মতে, হিন্দু ও মুসলমানেরা দুটি পৃথক জাতি। তাদের নাম পরিচয়ও আলাদা। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান একত্রে আহার করে না। সুতরাং যে কোনো আন্তর্জাতিক মানদন্ডে মুসলমানেরা একটি পৃথক জাতি। তাই ভারতীয় উপমহাদেশে মুসমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র থাকা প্রয়োজন।

ময়মনসিংহ গীতিকা :

ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। এটি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে চারখন্ডে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত সাবেক ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের বিল, হাওর ও বিভিন্ন নদ-নদী প্লাবিত বিস্তৃত ভাটি অঞ্চলে বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার যে শতদলগুলো বিকশিত হয়েছিল তাই 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে দেশে-বিদেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৈমনসিংহ গীতিকায় এসব অঞ্চলের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে। এ সমাজে নারীর স্বাধীন প্রেমের যে স্বীকৃতি রয়েছে তার অনুসরণে গীতিকাগুলোতে নারী চরিত্রের রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনীগুলো প্রেমমূলক এবং তাতে নারী চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র্য, সতীত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এসব গীতিকায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

ম্যাডোনা-৪৩ :

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের আঁকা একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর্ম হচ্ছে 'ম্যাডোনা-৪৩'। এটি ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০ সাল) বাংলার দুর্ভিক্ষের ওপর আঁকা বিখ্যাত সিরিজ চিত্রকর্মগুলোর একটি।

লালনগীতি এবং এর প্রভাব :

বাংলার বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের রচিত আধ্যাত্মিক গানগুলো 'লালনগীতি' নামে পরিচিত। বর্তমানে সর্বমহলে এ গান সমাদৃত। লানগীতিতে রয়েছে বেশ ভাবগাম্ভীর্যতা, মাধুর্যতা ও সুরের মোহ। এসব গীত কামনা-বাসনা, আশা ও আনন্দ-বেদনার এক আলোড়ন ও আবেগের সৃষ্টি করে। এ গানের অনুভূতি মন কেড়ে নেয়। সব গান থেকে এ গানের গতি, সুর স্বচ্ছতা একেবারে স্বকীয়। বাংলায় অন্য সব গানের তুলনায় এ গানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

লোকসাহিত্য :

এক কথায় সাধারণ মানুষের মনের কথা, মুখের কথা ভাষা ও ছন্দে বাণীবদ্ধ হয়ে এবং লোকমুখে তা প্রচারিত ও প্রচলিত হয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে লোকসাহিত্য বলে। সমালোচকদের মতে, যে সাহিত্য লেখা হয়নি তালপাতার মূল্যবান গাত্রে, যে সাহিত্য পায়নি সমাজের উচুঁতলার লোকদের সমাদর, যে সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের কথা বলেছে গানে গানে, যে সাহিত্যের রচয়িতার নামও অনেক সময় হারিয়ে গেছে, তাকে বলা হয় লোকসাহিত্য। এ সাহিত্য সাধারণ মানুষ ও পল্লীর আলোছায়া, ভালোবাসা ও স্মৃতিকে সম্বল করে বেঁচে আছে। আমরা অনেক ছড়া, গান, গীতিকা, গাথা পড়ি ও শুনি। কিন্তু জানি না সেগুলোর রচয়িতা কারা? এগুলো অনেক দিন ধরে বেঁচে আছে পল্লীর মানুষের কণ্ঠে। কোন কবি-সাহিত্যিক লিখেছিলেন এ বেদনাময় কাহিনী তাও আমরা জানি না। কিন্তু এগুলো বেঁচে আছে চিরকাল। সুতরাং বলা যায়, যে সাহিত্য কোনো বিশেষ ব্যক্তিচিন্তা বা সাধনা থেকে উদ্ভূত না হয়ে মানুষের মনে আপনা থেকেই জন্মায়, যার মধ্যে কোনো নিগূঢ় তত্ত্বকথা বা কোনো রকমের নীতি উপদেশ নিহিত থাকে না, কিন্তু নিতান্ত সরল প্রাণের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না প্রভৃতির অনাড়ম্বর প্রকাশ ঘটে এবং যা নিত্য পরিবর্তনশীল নদীস্রোতের মতো মানুষের মনে বিরাজ করে, তাকেই লোকসাহিত্য বলে। সাধারণ মানুষের মনের সহজ ও স্বচ্ছন্দ রূপায়ণ হলো লোকসাহিত্য। বাংলার লোকসাহিত্য বাঙ্গালির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ধারার প্রতিচ্ছবি। এ কারণেই লোকসাহিত্য শাশ্বত বাঙ্গালি জাতির সম্পদ-জাতির যুগ- যুগান্তরের হৃদয় ছবি।

Scanned by CamScanner